।। অষ্টম অধ্যায় ।।

।। স্বদেশী আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য ।।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও বাংলার মুসলিম মানসিকতা

১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন জাতীয় ইতিহাসে সংগ্রাম মুখর ধারার একদিকে যেমন এক উজ্জ্বল বৎসর অন্যদিকে এই বৎসর থেকেই হিন্দু - মুসলমান ক্ষেত্র পৃথক হতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ ছিল ইংরেজ সরকারের এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু কারণ ছিল অনেক। মুসলিম সমাজকে পৃথক করে জাতীয় আন্দোলনের তীব্র ধারাকে অচল করা ছিল ইংরেজদের এক লক্ষ্য। তাই পূর্ব বঙ্গে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান সমাজ এই আন্দোলনের পক্ষে যায় নি। সমর্থন করেছিল ইংরেজদের। ১৯০৫ এর মুসলিম মানস বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তে অবিচলতার সমর্থক থাকার জন্য যে সকল কারণ ছিল তা পর্যালোচনার পূর্বে প্রাক স্বদেশী যুগের কিছু চিত্র স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

প্রাক স্বদেশী যুগে ১৮৮৫ তে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৮৫ হতে ১৯০৫ অবধি মুসলিম মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছিল। এবং এই কালখণ্ডের পরিবেশে ১৯০৫ হতে ১৯১১ অবধি স্বদেশী যুগে মুসলিম মানসিকতার ক্ষুব্ধ প্রকাশ ঘটেছিল। এই ক্ষুব্ধতার পিছনে ছিল এক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাতাবরণ।

বাংলার মুসলমান সমাজ বিশ্বের মুসলিম জগতের সাথে পরিচিতি লাভ করেছিল মুসলিম বাংলা সাহিত্য হতে। সাহিত্য হতেই তাদের ধারণা জন্মেছিল আরব, ইরাণ, তুরাণ, খোরাসান, সিরিয়া, মিশর ইত্যাদি দেশের ও তাদের পীর পয়গম্বরদের কাহিনী সম্পর্কে। সুকুমার সেন বলেছেন, " উনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানের এক লেখক ইসলামী বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রণয় কাহিনী গুলির একটি ফিরিস্তি দিয়েছেন।

খারার করিল কত আশকের তরে
জেলেখা খারার হৈল ইউসুফ উপরে ।
লায়লি উপরে মজনু হৈল আশক
সংসার বিখ্যাত যার আশকি সাদক ।
কামকলা লাগি হৈল কুতায় বেহাল
সয়ফুল - মুলুক পরে বদিউজ্জামাল
মেহের নেগার পরে আশক আমীর
লড়াই করিল হন্দ এশকের খাতির ।

আজ আমরা ভুলে গিয়েছি যে আমাদের পূর্বপুরুষরা এই সব আশকে খারাবির গল্পেই মশগুল হতেন । " ১

এই বাংলার মুসলমানেরা মধ্য প্রাচ্য বা আরব দুনিয়ার ইতিহাস , কিংবদন্তী বা কাহিনী সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং এদের সাথে সম্পর্ক রাখার গর্ব অনুভব করতেন । এইভাবে পানইসলামীয় দৃষ্টিকোনের সাথে তারা যুক্ত হোন । ২

ইংরাজ শাসনের প্রবর্তনে মুসলিম সমাজ কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল । কারণ তাদের ধারণা ছিল ইংরেজ শাসন না প্রবর্তিত হলে মারাঠা ও শিখ সাম্রাজ্য সারা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হতো যেটা হতো হিন্দু আধিপত্যের লক্ষণ । মুসলিম মানসের এই চিত্র তদানীন্তন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । ১৩০৬ (১৮৯৯) এর পৌষ সংখ্যায় ' মিহির ও সুধাকর ' পত্রিকা মন্তব্য করে যে বৃত্তর যুদ্ধে ইংরাজদের সাফল্য আসুক । তারা ব্রিটিশ পতাকার বিজয় চেয়েছিল । বাংলা ১৩১০ (১৯০৩) এর শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায় মুসলিম পত্রিকা ' ইসলাম প্রচারক ' মন্তব্য করে যে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় তারা আনন্দিত কারণ এর ফলে মারাঠা শিখদের আগ্রাসন হতে মুসলিম সমাজ নিরাপত্তায় অধিষ্ঠিত ।

ঊনবিংশ শতকের শেষে কংগ্রেস প্রভাবশালী হয়ে উঠে। তবুও মুসলিম সমাজ কংগ্রেসকে আপন করতে পারেনি। ফলে তারা কংগ্রেস হতে নিজেদের সরিয়ে রাখতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করছিল এটি একটি কারণ ছিল। অন্য কারণ ছিল কংগ্রেস কোন রাজনৈতিক বা আর্থিক সুবিধা লাভ করলে সেই সুবিধা পাবে হিন্দু শ্রেণী। মুসলমানদের এই ভাবনা ১৮৯৭ সালে ' হাফেজ ' পত্রিকার মন্তব্য ধরা পড়ে।

" ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে ৭২ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন, তার মধ্যে দুজন মাত্র মুসলমান ছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে ৪৩১ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন, তার মধ্যে ৩৩ জন মুসলমান ছিলেন। ১৮৮৯ খৃ: অধিবেশনে ১৮৮৯ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন, তার মধ্যে ২০৮ জন মুসলমান ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যত প্রতিনিধি কংগ্রেস অধিবেশনে সমূহে যোগদান করেন তার মধ্যে শতকরা দশভাগ প্রতিনিধি ছিলেন মুসলমান। আবার তার মধ্যে বাঙালী মুসলমানের প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল খুবই নগন্য। " ৩

ফলে মুসলমান জগতের অন্যান্য নেতার কথাই সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণ যোগ্য ছিল বেশী। কংগ্রেসের প্রথম সারির যে সব মুসলমান নেতা ছিলেন তাঁদের সামগ্রিক দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোন থাকা সত্ত্বেও তাঁরা মুসলমান সমাজকে কংগ্রেসের প্রতি বা আন্দোলনের প্রতি প্রভাবান্বিত করতে পারেন নি।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের পটভূমিতে হিন্দু সমাজের অগ্রগতি মুসলমান সমাজের চাইতে বেশী হয়েছিল। মুসলিম সমাজ হিন্দুদের এই অগ্রগতির জন্য হিন্দু সমাজকেই ঈর্ষা ছাড়া স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখেনি। ১৩১০ এর জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ় সংখ্যায় ' ইসলাম প্রচারক ' অভিমত প্রকাশ করে যে হিন্দুরা অকৃতজ্ঞ উদ্ধত। মুসলিম শাসনের আমলে তারা মুসলমানের আনুকূল্য লাভ করেন তা তারা ভুলে গেছেন। হিন্দুরা মুসলমানদের ঘৃণা করেন এবং কংগ্রেসও তাই করে।

এছাড়া ইংরাজী শাসনের গোড়ায় ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু সমাজ চাকুরীতে যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। কর্ম ভাবনায় বেকারত্ব মুসলিম সমাজকে হিন্দু সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন করে তোলে। 'কোহিনূর' পত্রিকা (১৩০৩, ভাদ্র) ও 'নবনূর' পত্রিকা (১৩১০, শ্রাবণ) মন্তব্য করে যে সরকারী পদে হিন্দুদেরই প্রাধান্য। এরা মুসলিমদের প্রমোশনে বাধা দেয়।

ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের প্রথম ভাগ ছিল বাংলা সাহিত্যের চরম বিকাশের ক্ষণ। বাংলা সাহিত্যের এই উর্বরা ভূমিতে মুসলমান সমাজ অনুভব করলো তারা যেন বাংলা সাহিত্যের এই পৃষ্ঠভূমিতে অপাঙক্তেয়। এর ফল স্বরূপ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী 'মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির' সভায় এক প্রস্তাব ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। কিন্তু তদানীন্তন সাহিত্যিক জগৎ তাঁদের এই ক্ষোভকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হোন। 'ইসলাম প্রচারক' (১৩১০ এর অগ্রহায়ণ - পৌষ সংখ্যায়) মন্তব্য করে যে ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন চন্দ্র সেন থেকে আরম্ভ করে তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্য সকলেই তাঁদের রচনায় মুসলমান সমাজকে নিন্দা ও অবজ্ঞা করেন। তাঁদের গৌরব ম্লান করে দেখানো হয়। মুসলমান মেয়েদের পর্দা হতে বাইরে আনার চেষ্টা চলে। হিন্দু পুরুষের সাথে মুসলমান রমণীর সাথে প্রেমের চিত্র কল্পনা করা হয়। আর সব মুসলমানেরাই 'যবন'। হিন্দু লেখক যেন 'যবনের শত্রু।'

এই যুগে মুসলমান সমাজের দারিদ্র প্রকট ছিল। কর্ম হীনতা তীব্র ছিল। ব্রিটিশ ভারতে শোষণ ছিল তীব্র। এই শোষণে হিন্দু মুসলমানে ভেদ ছিল না। ভারতের সম্পদ ইংলন্ডে স্থানান্তরিত হতো। ভারত হতো নিঃশেষিত। দাদাভাই নৌরোজী ও রমেশ চন্দ্র দত্তের মতো ব্যক্তিরা একে 'Economic drain' বলতেন। উনিশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের প্রথমে গরীব মুসলমান চাষী হিন্দু আইনজীবীদের আশ্রয় নিত। মুসলমানেরা মামলা মোকদ্দমায় জর্জরিত ছিল বলে আর্থিক দিক দিয়ে

তারা বিধ্বস্ত ছিল। তাদের সঞ্চিত অর্থ যাও থাকত তা শিক্ষিত হিন্দুদের নিকট চলে যেত। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মুসলিম লেখকরা এর নাম দিয়েছিলেন 'Economic Drain' অর্থাৎ মুসলমান সমাজের নিকট হতে হিন্দু সমাজের দিকে তাদের অর্থ নিঃশেষিত হওয়া।

সামাজিক পরিকাঠামোতে মুসলমান মানসিকতা যখন এই ভাবে মূর্ত রূপ লাভ করেছে তখন লর্ড কার্জন ভারতে এলেন এবং তিনি বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করলেন। বাঙ্গালাকে কেন্দ্র করে ভারতে যে নব জাগ্রত জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল তাকে আঘাত হানারও একান্ত দরকার ছিল। এই জাতীয়তাবাদকে প্রতিহত করার একটি মাত্রই তখন অস্ত্র ইংরেজের কাছে বিবেচিত হয়েছিল 'Divide and rule'। এবং মুখ্য মুসলিম মানসকে কাছে টানার প্রচেষ্টায় ব্রতী হলেন কার্জন। তিনি ব্রডরিককে এক চিঠি লেখেন (১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪) তাতে কার্জনের মানসিকতা প্রকাশিত।
"The Bengalis, who like to think themselves a nation, and who dream of a future when the English will have been turned out and Bengali Babu will be installed in Government House, Calcutta, of course bitterly resent any disruption that will be likely to interfere with the realisation of this dream. If we are weak enough to yield do their clamour now we shall not be able to dismember or reduce Bengal again, and you will be cementing and solidifying, On the eastern flank of India, a force already formidable, and certain to be a source of increasing trouble in future". ৪

ঢাকায় গিয়ে কার্জন মুসলমান সমাজের প্রতি ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহকে দলে টানলেন। কারণ ইংরেজ জানত "it is only the Hindu population.... which constitutes the political voice of the province". ৫

কার্জন ঢাকায় বললেন মুসলিমদের , "The scheme 'would invest the Mohammedans in Eastern Bengal with a unity which they have not enjoyed since the days of the old Mussalman viceroys and kings"." ৬

শুধু তাই নয় ইংরেজ সরকার আরও ঘোষণা করল , "what was really the final draft of the partition plan, emphasised that Dacca in course of time would acquire"the special character of a provincial capital where Mohammedan interests would be xx strongly represented if not predominant"." ৭

১৯০৫ এর ১৬ই অক্টোবর বাংলা বিভাগ হলো । বিভাগ হলো বাংলা সংস্কৃতিরও । বাংলার খণ্ডিত অবস্থায় ফরাজী নেতা মৌলবী কফিল আলদিন ও খান বাহাদুর সৈয়দ আলদিন বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে ও স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঢাকার সলিমুল্লার সাথে একত্রিত হলেন । ওয়াহাবি ও তাঐউনি দলের সদস্যরা ও সমর্থকেরাও বঙ্গভঙ্গের পক্ষে গেলেন । ৮ এই সকল মুসলমান নেতা ও মৌলবী - মোল্লার সাথে গ্রাম বাংলার সাধারণ মুসলমানদের প্রত্যক্ষভাবে যোগ ছিল , তাই এরা বিশাল সংখ্যায় স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে গেল ।

কিন্তু মুসলিম মানসের এটি হলো একটি চিত্র । কিন্তু এই আন্দোলনে হিন্দু মুসলমান " ঐক্যের অনেক হৃদয় উষ্ণকারী দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল , বিশেষ করে প্রথম দিনগুলিতে , এবং সেই আন্দোলনে বেশকিছু সংখ্যক মুসলমান স্বদেশী নেতাকে সামনে নিয়ে এসেছিল , যাঁরা ছিলেন তাঁদের হিন্দু পক্ষের নেতাদের মতোই সমান দেশ প্রেমিক ও সদিচ্ছা প্রণোদিত যাঁদেরকে এখন যে ভাবে স্মরণ রাখা হয় , তার থেকে অনেক বেশী তাঁরা স্মরণযোগ্য । এঁদের মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখ করা

যেতে পারে তাঁরা হলেন আবুল কাসেম , গজনাভী , মসুল , আবুল হোসেন দীন মোহাম্মদ , দেদার বক্স , লিয়াকত হোসেন , আবদুল গফুর এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজী । " ১

বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনে মুসলিম সমাজের দ্বিমুখী প্রবাহই কাজ করেছিল । একদল বিরুদ্ধে ও একদল পক্ষে । প্রচারও হয়েছিল সেইরূপ বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গনে ।

মীর মশাররফ হোসেন

- - - - - - - - - - - - -

মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম গুনধর মুসলমান লেখক । তাঁর রচনার ভাষা ও শিল্প সৌন্দর্য্যের রীতি অভিনব । সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি আত্মজীবনী ও ইসলাম ধর্মের রচনায় ব্যাপৃত । মশারফ উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না । নগর কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক শহরের বহুদূরে তাঁর ছিল অবস্থান । তবুও যুগ চেতনা তাঁর সাহিত্যে সমৃদ্ধ ছিল । " ব্যক্তি ও ব্যষ্টির সংকট , উনিশ শতকের রেনেসাঁসের ফলে উদ্ভূত সংকট , বাঙালী মধ্যবিত্ত মুসলমানের সংকট , রূপ প্রতীকের ধারার সংকট — সমস্ত কিছুই তাঁর গদ্য রচনায় কম বেশী চেতন - অবচেতন ভাবে মূর্ত , একজন শিল্পী কোন ভাবেই সমাজ বিচ্ছিন্ন নন কী লেখনীতে কী তুলিতে , কী সঙ্গীতে , কী স্থাপত্যে , সমাজের চার পাশের জঙ্গম ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে । এই ক্রিয়াশীলতা সমাজের প্রেক্ষাপট , পটভূমিকে প্রকাশ করে সত্য , কিন্তু তার চেয়েও যা বেশী প্রকাশ করে , তা হচ্ছে সমাজের অন্তর্নিহিত গতিকে — সমাজের চলমান মূলধারাকে।" ১০ এই ধারাতেই মশারফের আবির্ভাব ।

মশারফ জন্মে ছিলেন ১৮৪৮ । এক দশক পরেই ভারত দেখেছিল সিপাহী বিদ্রোহ । মশারফের মৃত্যু ১৯১২ । বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন তখন স্তব্ধ । মৃত্যুর

পূর্বেই বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন দানা বাঁধে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন মশাররফ প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করেছেন। ১৮৬৩ তে গঠিত হয়েছে Mahamedan Literary Society, ১৮৭৮'এ National Mahamedan Association।
মুসলিম সমাজ তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধরে রাখায় আগ্রহী। নবাব আবদুল লতীফের নেতৃত্বে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় Mahamedan Literary Society এবং ১৮৭৮ এ আমীর আলীর উদ্যোগে National Mahamedan Association এর জন্ম হয়। কিন্তু এই দুটো প্রতিষ্ঠানই বাংলা ভাষা বা সংস্কৃতির কোন চর্চাই করেনি। এইরূপ এক শূন্যতার মধ্যে মশাররফের আবির্ভাব।

তাঁর প্রথম রচনা 'রত্নবতী' (১৮৬৯)। লেখক গ্রন্থটিকে কৌতুকাবহ উপন্যাস রূপে দেখেছেন। বিষয় বস্তু রাজপুত্র সুকুমার ও মন্ত্রীপুত্র সুমন্তের মধ্যে 'ধন বড় না বিদ্যা বড়' — এ বিতর্ক বিষয় ও তার শেষ পরিণতি 'রত্নবতী'র উপজীব্য বিষয়। রাজকুমার মন্ত্রীপুত্রের উত্তরে মন্তব্য করছেন, "এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনন্দন বিরক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, না তাহা কখনই হইতে পারে না। আমরা সচরাচর দেখিতেছি ধনবানেরা জগজ্জন মধ্যে বিশেষ গণ্য ও আদরণীয় হন। তাহারা কোন বিষয়ে নির্ধন লোকের ন্যায় চিন্তাজ্বরে জর্জরীভূত হন না, বিপদেও চিত্ত সুখ সন্তোষ করিয়া নিশ্চিন্তে কাল যাপন করেন। এমন কি তিলার্ধ কালের জন্য দুঃখিত থাকেন না। নির্ধন ব্যক্তি যতই কেন বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হউন না, তাহাদিগকে চিরদিন ধনী দিগের পদানত ভৃত্য থাকিতে হয়।" ১১

কিন্তু মন্ত্রী পুত্রের উক্তি — "বন্ধো, পরম কারুণিক পরমেশ্বরের যে সমুদয় বৃত্তি প্রদান করিয়া মানব কুলের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, বিদ্যা ভিন্ন তাহা পরিমার্জিত হয় না। যে জ্ঞানের নিমিত্ত, মনুষ্যেরা সকল প্রকার জীব জন্তুর উপর একাধিপত্য স্থাপন ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহাও বিদ্যা ব্যতীত লব্ধ হয় নাই।"

'রত্নবতী'কে বিবাহ লাভের জন্য রাজকুমারের বিপদে পড়ে বন্দী হওয়া ও পরে মন্ত্রী পুত্রের সহায়তায় মুক্তিলাভে এই উপন্যাস শেষ হয়েছে। মন্ত্রীপুত্র, বুদ্ধি ও

বিদায় বলে কিভাবে সকলকে উদ্ধার করলেন ' রত্নবতী 'তে তারই বিবরণ । বন্ধুর সহিত মিলিত হওয়ার ভাষা বড় অপূর্ব । " তৎক্ষণাৎ তিনি হর্ষ বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া সাশ্রু নয়নে বন্ধুকে আলিঙ্গন পূর্বক উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন । আনন্দে তাহার মন এমনি বিহ্বল হইয়াছিল যে পুনঃ বন্ধু বন্ধু শব্দ উচ্চারণ করিয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় অনিমিষ লোচনে বন্ধুর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন । দৃষ্টি আর ফিরিল না । উভয়ের চিত্তে জলধিতরঙ্গের ন্যায় প্রণয় হিল্লোল বহিতে লাগিল । মধ্যে মধ্যে সাগর যেমন বায়ু প্রতিঘাতে বেলাকে আঘাত করে সেইরূপ তাহাদিগের দুঃখ জলধি চিন্তার বায়ুর প্রতিঘাতে সঙ্গীত হইয়া হৃদয়কে আঘাত করিতে লাগিল । " ১২

'বিষাদ সিন্ধু ' তাঁর অন্যতম রচনা । মুসলিম ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে লেখা । মুসলমানদের কোনো উল্লেখযোগ্য ' মিথলজি ' নাই । মিথলজির আশ্রয়ে হিন্দু ধর্মে দেবদেবীর মহিমা প্রচারিত হয় । নিরক্ষর , অল্প শিক্ষিত সাধারণ হিন্দুরা পালা পার্বনে , রামায়ণ , মহাভারত , পাঁচালি , কথকতার মাধ্যমে সাহিত্য রস আস্বাদনের সঙ্গে ধর্ম পালনের তৃপ্তি আদায় করতে পারে সহজেই । তুলনায় মুসলমানদের নিরাকার চেতনাবাহী ধর্মীয় কাঠামো অন্তত নিরক্ষর , স্বল্প শিক্ষিত এবং ইসলাম ধর্মাস্তরিতদের কাছে সুখ বোধ হওয়ার কথা । আর এ দেশে " লোক শ্রুতি ও আউলিয়া দরবেশ ফকিরদের কেরামতি , সামাজিক সাম্য ও ভাবালুতা সম্বল করে প্রচারিত হয়েছিল ইসলাম । ১৩ মশারফ হোসেন ' বিষাদ সিন্ধু ' লিখবার পশ্চাতে স্বধর্মের মহিমা জ্ঞাপনেচ্ছা হয়তো ছিল না । " মহরমের মূল ঘটনাটি বঙ্গভাষা প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য ।"১৪

' বিষাদ সিন্ধু 'তে মুসলমান পাঠকের অত্যন্ত স্মরণীয় ঘটনাকে তিনি বাংলা সাহিত্যে উপস্থাপন করে একে উপন্যাসের মতো বেগবান করেছেন । একদিকে পুঁথির অলৌকিকতা অন্যদিকে বীরত্বে উদ্ভাবন তাঁর সৃষ্টির মূল প্রেরণা ছিল । আবেগ তাড়িত হৃদয়ে মশারফ সাবলীল ভাষার ব্যবহার করেছেন ।

" সীমার , একটু দাঁড়াও । আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাও । কার সাধ্য তোমার গমনে বাধা দেয় । কার ক্ষমতা তোমাকে কিছু বলে ? একটু দাঁড়াও । এশিরে তোমার স্বার্থ কি ? খণ্ডিত শিরে প্রয়োজন কি ? অর্থ ? হায় রে অর্থ । হায় রে পাতকী অর্থ । তুই জগতের সকল অনর্থের মূল । জীবের জীবন ধ্বংস , সম্পত্তির বিনাশ , পিতা পুত্রে শত্রুতা , সকল স্বামী স্ত্রীতে মনোমালিন্য , ভ্রাতা ভগ্নিতে কলহ , রাজা প্রজায় বৈরীভাব , বন্ধু বান্ধবে বিচ্ছেদ , বিবাদ , বিসম্বাদ , কলহ , বিরহ , বিসর্জ্জন , বিনাশ এ সকল তোমারই জন্য । " ১৫

মশাররফ হোসেনের স্বাধীনতা ছিল আকাঙ্খিত বস্তু । ' বিষাদ সিন্ধু 'র উদ্ধার পর্বে স্বাধীনতা সম্পর্কে মশারফ হোসেন বলছেন , " স্বাধীনতা কি মধুমাখা কথা , স্বাধীন জীবন কি আনন্দময় । স্বাধীন দেশ কি আরামের স্থান । স্বাধীন ভাবের কথাগুলি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে হৃদয়ের সুপ্ত শিরা পর্য্যন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে স্ফীত হইয়া উঠে এবং অন্তরে বিবিধ ভাবের উদয় হয় । " ১৬

মশাররফের ' গোজীবন ' প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সালে । এই প্রবন্ধ যুক্তি তর্কের জোরে প্রতিষ্ঠিত । লেখকের বক্তব্য , পাঠক , মোসলমান কবিগণ পারস্য ভাষায় কসাইয়ের বর্ণনা কিরূপ করিয়াছেন ? যে গো - হত্যা করে তাহাকেই কি কসাই বলিয়াছেন ? তাহা নহে । যাহার অন্তরে দয়ামায়া , মমতা কিছুই নাই পর দুঃখে যাহার হৃদয় কাতর নহে , ব্যথা বোধ না করে তাহাকেই কসাই বলিয়াছেন , সে সর্বেই পাপ হৃদয়ের , কসাই হৃদয়ের তুলনা করিয়াছেন । মোসলমান কবিদিগকে সহস্র ধন্যবাদ শাস্ত্র সঙ্গত কার্য্য বলিয়া তাহারা কসাইকে উচ্চাসনে বসাইয়া যান নাই । মহা ঋষি , যোগী , ঘোর তপস্বী বলিয়া সম্ভাষণ করেন নাই । কসাই নীচ , অতি জঘন্য , কসাইকে মনুষ্য দলের মধ্যে পরিগণিত করেন নাই । গো - জীবন হত্যা করে বলিয়া এত অপমান , এত শাস্তি আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইতেছে । কিন্তু গো খাদককে কেহ কিছু বলেন নাই , কি ভ্রম , কিভ্রম । " তিনি এই প্রবন্ধে আরও বলছেন , " ..... ধর্ম্মে আঘাত লাগে না , গোমাংস পরিত্যাগ করিলে ঘরকন্নারও ব্যাঘাত জন্মে না । উন্নতি পথে কাঁটা পড়ে না । প্রাণের হানিও বোধহয় হয় না । এ অবস্থায় গো হিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি ? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি

নাই , অথচ চির সহযোগী ভ্রাতার মন রক্ষা , ধর্ম রক্ষা , আর যাহা রক্ষা , তাহা বার বার বলিব না । যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয় সে ত্যাগে ক্ষতি কি ?" ১৭

' গো জীবন ' প্রকাশ সেদিন মুসলমান সমাজে প্রচন্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল । লেখক মুসলমান নয় হিন্দু এ ধরণের কটু মন্তব্যও বর্ষিত হয়েছিল । প্রচন্ড বিতর্ক শুরু হয় । "এর পরিণামে তাঁকে ' তওবা ' পড়ে ' গো জীবন ' প্রকাশ বন্ধের অঙ্গীকার করতে হয় । " ১৮

মীর মশাররফের ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয় ' সঙ্গীত লহরী ' । মশাররফের জীবনে সাহিত্য ধর্ম সমাজ তাঁর বিশ্বাসের বলিষ্ঠতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল । এই কবিতায় তিনি জাতীয় ঐক্যের প্রসঙ্গে চিন্তা করে হিন্দু মুসলমান মিলনের ডাক দিয়েছেন –

" ওরে ভারত জাগ জাগ দিন গেল
ঘুমের ঘোরে থেকে তোমার সর্বনাশ হইল ।"

১৮৮৯ এ প্রকাশিত ' বেহুলা গীতাভিনয় ' এর মধ্যে মশাররফ হোসেন ইংরেজদের অত্যাচারের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করে এই রাজ শক্তিকে প্রতিরোধ করতে আহ্বান জানিয়েছেন ।

' বর্ষশেষ ' কালে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রসারিত হয়েছে । তাঁর শেষের দিকে রচনা মুসলমান ধর্মানুযায়ী বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে । মৌলুদ শরীর (১৯০৩) , ' বিবি খাদেজার বিবাহ ' (১৯০৫) , ' হজরত ওমর মহম্মদের ধর্ম্ম জীবন লাভ ' (১৯০৫) , ' মদিনার গৌরব ' (১৯০৬) , ' মোস্লেম বীরত্ব ' (১৯০৮) , ' হজরত ইউসুফ ' (১৯০৮) এই সব গ্রন্থ মুসলমান মানসিকতার ফসল । এই সকল গ্রন্থে হিন্দুদের অপদস্থ করে মুসলিম গৌরবের কথা প্রকাশিত না হলেও লেখক ~~হিন্দুদের~~ হিন্দুদের উন্নতি ও মুসলমানের অবনতিতে ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন । তিনি বলছেন –

৫৫ । বর্ষের বুনেদী দল গেছে সব রসাতল ,
কেহ মরা কেহ আধমরা ।

৫৬ । গেছে সব হিন্দু ঘরে কেহ না তা দৃষ্টি করে
আরও মুখে বলে ভাল তারা ॥

৫৭ । এক বার মাথা তুলে দেখ ভাই চক্ষু মেলে
মুসলমান কিসে হল সারা ।

৫৮ । জমিদারী কোথায় গেল সোনা রূপা কি হইল
এত ঘর কিসে গেল মারা ॥

৫৯ । চিরকাল হিন্দুগণ করিতেছে নির্যাতন
তবু জ্ঞান হলনারে হায় ।

৬০ । নিতেছে সকল টেনে তবু তারে নাহি চিনে
চক্ষে ধাঁধা এমনি লাগায় ॥

দেখ যত হিন্দু ঘর কিসে হল ধনেশ্বর
খোঁজ দেখি কারণ ইহার ।

প্রতি মুসলমান ঘরে চাকুরীর সাজপরে
সর্বনাশ করিল সবার ॥ ১৯

১৯১০ এ প্রকাশিত হলো মশারফ হোসেনের আত্মকাহিনী ' বিবিকুলসুম ' বা কুলসুম জীবনী । স্ত্রীর সম্পর্কে এই জীবনী গ্রন্থে লেখক বলছেন , " বিবি কুলসুম আমার জীবনীর জীবনী , জীবনের জীবনী , নয়নমন রঞ্জিনী , চিত্ত হারিণী , চিন্তা কর্ষিণী , আমার কানের মধুর ভাষিণী , সুহাসিণী , আমার সম্পূর্ণ ভালবাসার অধিকারিণী , সমভাবে সুখ দুঃখ ভোগিণী , মম চক্ষে কমল সদৃশ্য কমলা , সরলা , সতী সাধ্বী , বুদ্ধিমতী , বিদুষীবতী , দয়াবতী ও সর্বকার্য্যে সুমতি । " ২০

এই আত্ম জীবনীতে স্বদেশী আন্দোলনের উল্লেখ আছে । পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা

যখন জাতীয় আন্দোলনে তোলপাড় , সকলেই অংশ গ্রহণ করছেন , মুসলিম সম্প্রদায় এই আন্দোলন হতে বিচ্ছিন্ন । মীর মশারফ হোসেনও উদ্যমহীন । এই উদ্যমহীনতা বিবি কুলসুম সমর্থন করেছেন । তিনি বলছেন , " ঘরে তণ্ডুল নাস্তি , ওদিকে ধন কুবের অদ্বিতীয় রাজশক্তি সম্পন্ন ব্রিটিশ জাতি , বিদ্যাবুদ্ধিতে জগৎ শ্রেষ্ঠ । ... এমন নিরপেক্ষ রাজার অসন্তোষের কারণ , বিরক্তির কারণ করিয়া কি লাভ হইবে ? " ২১ তবু ১৯১০ সালে লেখা বঙ্গভঙ্গ কালে এই ধরণের ইংরেজ প্রশস্তিতে ইংরেজদের প্রতি বঙ্গভঙ্গ জনিত কারণে মুসলমান সমাজের কৃতজ্ঞতা বোধও হয়তো বা প্রকাশ পেয়েছে । ২২

মশারফের রচনায় জাতীয়ভাবে বদলে আছে ধর্মভাব । তিনি রাজনীতির আবর্তে উগ্র জাতীয়তাবাদী বা সমর্থক ছিলেন না । তাঁর শেষের রচনায় হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ তদানীন্তন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে এক ঝড়ের সংকেত দেখা যাচ্ছিল তার ইঙ্গিত এখানেই মিলে ।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০ - ১৯৩১)

স্বদেশী যুগের জাতীয়তাবাদী কবি ছিলেন সিরাজী । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বহু মুসলিম সাহিত্যিক পৃথকীকরণের পরিবেশে নিজেকে সরিয়ে রাখলেও সিরাজী নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন দেশের কাজে । শিশির কুমার বলছেন , " ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ – এই মনোভাব নিয়ে সে যুগে যে কজন মুসলিম লেখক সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন , সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁদের অগ্রগণ্য । তাঁর লেখার ভিত্তি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি , আদর্শ , এক জাতি এক প্রাণ । তাঁর লেখায় আছে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান । তিনি লিখেছিলেন , এই

ঐক্য বলে ' বহিবে ভারতে বিপুব প্লাবন , যাইয়া ভাসিয়া জঞ্জাল দূরে । " ২৩

এই যুগে মুসলিম সমাজকে জাগরণের বানী বহন করেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে সিরাজী অন্যতম । সিরাজী জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হলেও নিজস্ব ধর্ম নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি তিনি অনুরক্ত ছিলেন । সেই ভাবে তিনি মুসলমান সমাজকে জাগরণেরও গান শুনিয়েছেন । মুসলমান জাগরণ ও বিদেশীর হাত হতে ভারত উদ্ধার দুটোই তাঁর কাম্য ছিল ।

তাঁর প্রতিভা বহুমুখী ছিল । একাধারে বাগ্মী অন্যধারে কবি ও সাহিত্যিক , ঐতিহাসিক ও রাজনীতিক – সকল প্রতিভা তাঁকে আশ্রয় করে বৃদ্ধি পেয়েছিল । তাঁর রচিত গ্রন্থ গুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য – কাব্য ' অনল প্রবাহ ' (১৯০৭) , ' নবউদ্দীপনা ' (১৯০৭) , ' উচ্ছ্বাস ' (১২০৭) , ' উদ্বোধন ' (১২০৭) , সঙ্গীত সঞ্জীবনী ' (১২১৬) , উপন্যাস ' তারাবাঈ ' (১৯০৮) , ' মায় নন্দিনী ' (১৯১৮) , ' ফিরোজা বেগম ' (১২২৩) , ' নুরুদ্দীন ' (১২২৩) ।

তিনি যে কারণে সাহিত্য সেবায় কলম ধারণ করেছিলেন সেই প্রসঙ্গে বলছেন , " বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সেবকগণ , সাবধান ও সতর্ক হও । অনুকরণ করিতে যাইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িও না । ইসলামের পবিত্রতা ও প্রাচীরের বাইরে যাইয়া ভুলেও সাহিত্য সেবা করিও না । যদি বঙ্গ সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যে পরিণত করিতে চাও , যদি সাহিত্য শক্তি প্রভাবে জাতীয় জীবন তরীকে গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করিতে চাও – যদি বঙ্গ সাহিত্যের দ্বারা জাতীয় কল্যাণ ও কুশল কামনা কর , তাহা হইলে সর্বপ্রকারের কুচিন্তা কু কল্পনা ভীরুতা ও দীনতার হস্ত হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হও – বদ্ধ পরিকর হও । সুচিন্তার উদ্যানে উচ্চ কল্পনার স্বাস্থ্যকর উন্মুক্ত বায়ুতে ইহাকে বিচরণ করিতে দাও । জগতের যাবতীয় ধর্মবীরদিগের পবিত্র জীবনীর সৌন্দর্যরাশি সাহিত্যে প্রতিফলিত কর । পুরাবৃত্তের দৃশ্য প্রকটন করিয়া মানব জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি কোন কোন গুণে উন্নতি এবং কোন

কোন দোষে অধঃপতিত বা ধ্বংসের আবর্তে পতিত হইয়াছে তৎ সমুদায় দেখাইয়া দাও। প্রাণের উচ্ছ্বাসে হৃদয়ের তেজে, সত্যের প্রচারে সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমগ্র দেশকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ কর। দেখিবে সাহিত্য শক্তির ঝটিকা প্রবাহে অচিরেই জাতীয় জীবন মেঘোন্মুক্ত হইয়া সৌভাগ্য শশীর অমল ধবল কৌমুদী ছটায় আলোকিত এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সুশোভিত রহিয়াছে।" ২৪

সিরাজীর প্রাথমিক চিন্তায় একদিকে মুসলমান জাগরণ — ও তার জন্য মুসলমানদের পৃথক সত্তা বজায় রাখতে বলেছেন, "তোমরা সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন জাতি এবং ধর্মাবলম্বী পরন্তু তোমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও ভিন্ন রূপ।" ২৫
১৯০০ এর নভেম্বর ডিসেম্বর সংখ্যা সিরাজী 'নবনূরে' এক প্রবন্ধ লেখেন 'নবনূর ও জেহাদ'। তাতে তিনি মন্তব্য করেছেন, "যে পর্যান্ত সমগ্র পৃথিবীর মানব মন্ডলী এসলাম ধর্মে দীক্ষিত না হইবে, সে পর্যন্ত মুসলমানদিগের প্রতি জেহাদ করা আল্লাহতায়ালা নির্ধারিত করিয়াছেন।" ২৬

১৯০০ খৃষ্টাব্দে রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ঘটল। সিরাজী 'শোক লহরী'তে লিখলেন —

" অয়ি মাতঃ ভিক্টোরিয়া ভারত জননি,
তব সম পুন্যবতী কে হয়েছে কবে,
জগতের ছিলে তুমি মাতৃ-স্বরূপিণী,
তোমার সৌভাগ্য সম কার আর ভবে?"

কবিতাটির পাদটীকায় সম্পাদক লিখেছেন, "আমাদের মাতৃস্বরূপিণী মহারাণী ভারতেশ্বরীর আধিপত্য কালে, ভারতীয় মুসলমানগণ উন্নতির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এজন্য মুসলমান জাতি তাহাদের স্বর্গীয় মাতার প্রতি হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞ। মুসলমানগণ ভিক্টোরিয়ার আধিপত্যকালেই ইংরাজী শিক্ষার দিকে

মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং তাহার ফল স্বরূপ বিশ্ব বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ লোক অনেক দেখা যাইতেছে । ২৭

সিরাজীর প্রথম রচনাগুলিতে এই ধরণের আনুগত্যবোধ মুসলমান লেখক রূপে তাঁর ছিল । ১৯০৬ এর ' অনল প্রবাহে 'র প্রথম সংস্করণ বের হলো । প্রেরণাদাতা ছিলেন মুনশী মেহেরুল্লা । ১৯০৭ প্রকাশিত হলো ' অনল প্রবাহে 'র দ্বিতীয় সংস্করণ । এতে মুসলমান জাগরণের সাথে ইংরেজ বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে । ' অনল প্রবাহে 'র উৎসর্গে কবি বলছেন —

ইসলামের গৌরবের বিজয় কেতন ,
হে মোর আশার দীপ নবযুবগণ ।
মোসলেমের অভ্যুত্থানে
ইসলামের জয়গানে
আবার লভুক বিশ্ব নূতন জীবন ।

কবি মুসলিম চেতনার জড়তায় আঘাত হেনেছেন —

" তবু কি তোরা এহিবি , অজ্ঞান ,
আলস্য শয্যায় নিদ্রিত হইয়া ?
দেখরে চাহিয়া কত নীচ জাতি ,
তারাও জ্বালিছে উন্নতির বাতি
তারাও ছুটিছে কি বা দ্রুতগতি
নবীন উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া ।

কবির বক্তব্য —

সহস্র বর্ষের পতিত দলিত
খণ্ডধা বিচ্ছিন্ন ঘোর অবনত ,

এই হিন্দু জাতি হয়ে একমত
সাধিতেছে কি বা মহা অনুষ্ঠান ।

দীন দরিদ্র ভারতকে উদ্ধারের মানস ব্রতে তিনি মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানাচ্ছেন —

পতিত ভারতে করিতে উদ্ধার ,
ঘুচাতে দাসত্ব কলঙ্কের ভার ,
আনিতে ভারতে স্বাধীন জীবন
জাতীয় কলঙ্ক করিতে মোচন
করেছে সকলে কি পণ কঠিন ।
কিন্তু হয়ে তোরা বীর কুলোদ্ভব ,
আজি যেন হায় , মৃত প্রায় সব
উচ্চ লক্ষ্য আশা উন্নত ধারণা
বিসর্জ্জন দিয়া উন্নত কল্পনা
হয়েছ অধম ঘৃণিত হীন ।

বেদনার সাথে কবি অনুভব করেছেন —

যে জাতি জগতে আলো ছড়াইল ,
বীর দাপে যার ভুবন কাঁপিল ,
জগৎ যাদের চরণে লুঠিল ,
তারা আজি বিশ্বে ঘোর হতমান ।

কবি যেন বেদনার জ্বালায় মগ্ন —

সিংহের ঔরসে লভিয়া জনম
হয়েছিস হায় , শৃগাল অধম
হায় রে কি কব , বিদরে মরম ,
এ কোমল প্রাণ সতত জ্বলে ।
' অনলের জাতি ' তোরা যে অনল
তবে কেন আজি অলস , দুর্ব্বল ?
জাগরে সকলে ধরি পূর্ব্ব বল ,
আলস্য জড়তা চরণে দলে ।

কবি আত্ম সমালোচনার শেষে দেশের উন্নতির জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন —

যাক সে সকল দাওরে ছাড়িয়া ,
ভারতেই দেখ নয়ন মেলিয়া ,
অযোধ্যা পাঞ্জাব বোম্বাই খুঁড়িয়া ,
যত মুসলমান ঐক্যেতে মিলিয়া
অতীত গৌরবে প্রলুব্ধ হইয়া
ছুটিছে কেমন উন্নতি পথে ।

লিখরে জীবনী লিখ ইতিহাস
লিখ বীর গাথা করহ প্রকাশ ,
জাতীয় চিত্রের জ্বলন্ত আভাস
সবার নয়নে করহ ধারণ ।

স্ত্রী জাতি তরে দাও শিক্ষা দাও
জাতীয় উদ্যানে তাদের মাতাও ।
বাল্য পরিণয় উঠাইয়া দাও ,
সাম্য স্বাধীনতা তাহাদের দাও ,
উদিবে অচিরে সৌভাগ্য তপন ।

' নব উদ্দীপনা ' স্বদেশী যুগের উত্তাল তরঙ্গে লেখা । ' নব উদ্দীপনা ' ব্রিটিশ বিরোধী , হিন্দু - মুসলমান সম্প্রীতির কাব্য । এই কাব্য গ্রন্থে তিনি ভারত মাতার সন্তান হিন্দু মুসলমানকে একত্রিত হয়ে বিদেশীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন । কাব্যের কিছু কবিতা ' নব্য ভারতে ' প্রকাশিত হয়েছিল । কবি বলছেন —

" নেটিভ নিগার সদা খাই গালি
আপত্তি করিলে বন্দুকের গুলি
ভাসিয়া দিতেছে মস্তকের খুলি
অহো কি ভীষণ অত্যাচার হায় ।
পেটে নাই অন্ন পরিধানে বাস ,
অর্থবল বিনা মানস উদাস ।
কেবলি অভাব , কেবলি হতাশ ॥
ফিরিয়া চাহে না কেহই ঘৃণায় ॥

সোনার ভারতবর্ষ , জন্মভূমি ভারতবর্ষ বণিকের কুক্ষিগত হয়েছে । তাই সিরাজী ' নব উদ্দীপনায় ' দেশ ও সন্তানদের প্রাণ বলিদানের জন্য উৎসাহিত করেছেন —

' ভারত সন্তান কর আজি পন
প্রাণ দিয়া আজ লভিব জীবন ,
সাধন করিতে মায়ের কল্যাণ ,
মহোল্লাসে দিব প্রাণ বলিদান ,
আসি রব না এমনি পড়ে ।

কারণ ইংরেজ শাসকের অত্যাচারে দেশ আজ নিঃস , জর্জরিত —

সোনার ভারত হয়ে গেল ছাই
বল বীর্য ধন কিছু আর নাই
শিল্প বানিজ্য লুপ্ত সব ভাই ।

স্বদেশী যুগে সিরাজীর উদ্দেশ্য ছিল ভারত জননীর গৌরব গানে সকলকে উদ্বোধিত করা ।

" হায় , এ সিংহের দেশে এবে শৃগালের দল ,
নির্বিরোধে বিচরিছে করি মহা কোলাহল । (আমীরের আগমণ)

ভারতের শোভা বর্ণনা করে সিরাজী বলছেন —

বিশাল ভারতবর্ষ — প্রকৃতির রম্য উপবন ,
সুজলা সুফলা ভূমি — ঐশ্বর্য্যের মহা নিকেতন ।
সহস্র বরষ যথা — উড়েছিল তোমার কেতন
অনুগ্রহ ভিক্ষা আশে — ইংরেজ ফরাসীস্ গণ
যেদেশে আসিয়া আহা — হেরি তোমা গৌরব উন্নত ,
নমে ছিল তব পদে — করি শির আভূমি বিণত ,
স্বর্গাদপি গরীয়সী হায় — সেই সোনার ভারত
বণিক জাতির এবে — হইয়াছে পূর্ণ কুক্ষিগত । (দুর্যাধনি)

এরপর সিরাজী উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন । যদিও সিরাজী নাটক নভেল পছন্দ করতেন না । " সিরাজী লঘু সাহিত্য পাঠের বিরুদ্ধে ছিলেন । অধঃপতিত জাতি নাটক নভেল প্রেম সঙ্গীত ' যাত্রা থিয়েটার ' এর মাধ্যমে কোনদিন উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয় না এই ছিল তার মত । " ২৮

কিন্তু সিরাজী উপন্যাস রচনা করলেন । উপন্যাস রচনা করার পিছনে কারণ ছিল । তাঁর মতে , " নীচ মতি বঙ্কিম চন্দ্র এবং বর্তমান মুখোপাধ্যায় হইতে

আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক উদ্ভট ঔপন্যাসিক লেখকই অতি জঘন্য চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিশ্বপূজ্য মুসলমানের মুন্ডপাত এবং মর্ম্ম বিদ্ধ করিতে অসাধারণ প্রয়াস স্বীকার করিয়া আসিতেছেন । আমি নিজে এবং আরও কতিপয় মুসলমান লেখক এ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ নানা পত্র পত্রিকায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন । কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় নাই । " সেই জন্যই দেশ মাতৃকার কল্যাণের নিমিত্ত তাহাদের সাবধান - তার জন্য এবং মুসলমানের আত্মবোধ জন্মাইবার জন্যই উপন্যাসের ঘোর বিরোধী আমি , কর্ত্তব্যের তাড়নায় ' রায় নন্দিনী 'র রচনা করিয়াছি । " ২২

সিরাজী এই উক্তি করলেও তিনি ' তারাবাঈ ' রচনা করেন ১৩০৮ সালে । ' রায় নন্দিনী ' ১৩১৩ , ' নূরউদ্দীন ' ১৩১৬ ও ' ফিরোজা বেগমে 'র রচনা কাল ১৩১৮ । প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য মূলক উপন্যাস । এই সব উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের সাদৃশ্য নেই । কিন্তু ইসলামের গৌরব কে তুলে ধরার জন্য এই উপন্যাসগুলিতে কয়েকটি দৃষ্টি কোন তুলে ধরা হয়েছে । (১) হিন্দু যুবতী বা রাজকন্যা মুসলমান যুবক বা মুসলমান রাজপুত্রের নিকট প্রেম নিবেদন করছে । অনেকটা যেন উপযাচিকার মত । (২) অভিজাত বংশীয়া মুসলিম কন্যারা বা রাজপুত্রী তাচ্ছিল্য ও সদম্ভের সাথে হিন্দু রাজাদের নিবেদিত প্রেমকে প্রত্যাখান করছে । (৩) বঙ্কিম কে অনুসরণ করে সেই style এ রাজাদের সাথে মুসলমান নবাব সেনাপতির দ্বন্দ্ব । (৪) উপন্যাস - গুলিতে হিন্দুধর্মের একটি বিচ্যুতি দেখানো । (৫) উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টিতে মুসলিম সভ্যতা র গৌরবময় দিক প্রদর্শন করা বা তুলে ধরা । (৬) ইসলাম ধর্মের মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে বহু সংখ্যক হিন্দুর মুসলমান ধর্ম গ্রহণ । (৭) হিন্দু দেব দেবীদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য । এই সব উপাদান দিয়ে হিন্দু ঔপন্যাসিকদের যোগ্য জবাব দেওয়া ।

' তারাবাঈ ' উপন্যাসে তারাবাঈ কে শিবাজীর কন্যারূপে দেখানো হয়েছে । ' তারাবাঈ ' এর নায়ক আফজল খাঁ । আসলে তারাবাঈ একজন অমাত্য কন্যা । শিবাজীর

কন্যার সাথে আফজল খাঁর প্রেম প্রদর্শিত হলে শিবাজীর গৌরব ক্ষুন্ন হবে , ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি পাবে । সেই জন্য সিরাজী শিবাজীর কন্যা তারাবাঈকে দিয়ে আফজল খাঁকে প্রেম নিবেদন করিয়েছেন , এর ফলে বিয়ের মজলিসে চক্রান্তের চক্রান্তে তারাবাঈ নিহত হয়েছে ।

' রায় নন্দিনী 'র স্বর্ণময়ী কেদার রায়ের কন্যা নন । চাঁদ রায়ের কন্যা । এই কন্যাকে অপহরণ করে ঈশা খাঁ বিয়ে করেছেন । এই দুঃখে ও অপমানে চাঁদ রায় আত্মহত্যা করেন । রায় নন্দিনীতে রোমান্টিক পরিবেশ তৈরী করা ও সূক্ষ্ম - সূক্ষ বিবরণ দেওয়া সিরাজীর স্টাইল ছিল । ' রায় নন্দিনী ' উপন্যাসে ঈশা খাঁর পান চিবানো ও ছিবড়ে ফেলার বর্ণনা , স্বর্ণময়ীর ঈশা খাঁর পারস্য ভাষায় পত্র লেখা এবং তাতে আতর মাখানো , ঈশা খাঁর সৈন্য বাহিনী ও সম্পত্তির বিশদ বিবরণ যেমন তার পচানব্বই জন জমিদার , দুই হাজার পুষ্করিণী , তিন হাজার ইঁদারা , দুইশত পান্থশালা , ষাটটি মাদ্রাসার বিবরণ পাওয়া যায় । এই উপন্যাসে হাজার হাজার হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে ।

' ফিরোজা বেগম ' উপন্যাসে মুসলিম রাজ পরিবারের কন্যা ফিরোজা বেগমের সাথে জনৈক মারাঠা যুবকের প্রেমের চিত্র রয়েছে । কিন্তু প্রেম এক তরফা । মারাঠা যুবক বিভিন্ন প্রচেষ্টায় ফিরোজাকে পেতে চেয়েছে । কিন্তু ফিরোজার দৃঢ়তার জন্য মারাঠা যুবক ব্যর্থ হয়েছে । এই উপন্যাসে সিরাজী মুসলিম ও মারাঠার দ্বন্দ্ব সংগ্রামে মুসলিম ললনা ফিরোজাকে অনন্ত বুদ্ধি বিদ্যা ও মহাশক্তির উৎস রূপে অঙ্কিত করেছেন । এই উপন্যাস গুলিতে " যুগ - বিদ্রোহ , প্রেম - প্রণয় , কূটনীতি , কলা কৌশল , প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা সবই রয়েছে সিরাজীর .... নেই শুধু রক্ত মাংসের সজীব মানুষ । " ৩০

সিরাজী বঙ্কিম মানসিকতার বিরোধী হলেও তার উপন্যাস বঙ্কিমী স্টাইলে লেখা ।

" তাঁর লক্ষ্য হল যে বঙ্কিম চন্দ্র এ কথা এ সব উপন্যাস পড়লেই বোঝা যাবে। তিনি ভাবের ক্ষেত্রে বঙ্কিম চন্দ্রের বিরোধিতা করেছেন বটে, কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে পদের আনা বঙ্কিমানুসারী। এক আধখানা আরবি ফার্সী শব্দ দিলে বাকিটাই বঙ্কিমানুকরণ।" ৩১

সিরাজী চিন্তিয়ে দ্বিবিধ ধারা দেখা যায়। প্রধান বৈশিষ্ট্য মুসলমানত্ব, দ্বিতীয় বাঙালীত্ব। মুসলমান সত্তায় তিনি হিন্দুর প্রতিপক্ষ। দ্বিতীয় সত্তায় অর্থাৎ বাঙালীত্বে তিনি বৃটিশ বিরোধী। তাই হিন্দু প্রতিপক্ষ রূপে মুসলিম জাগরণের উপন্যাস লিখেছেন বাঙালী রূপে বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন

বৃটিশ বিরোধী মনোভাব পাওয়া যাবে তাঁর রচিত কাব্য ' অনল প্রবাহ ', ' নব উদ্দীপনা ' ও ' উচ্ছ্বাসে '। অনল প্রবাহের জন্য তাঁর কারাবাস ঘটেছে। বাংলা সরকারের সেক্রেটারী A.W.Duke I.C.S ভারত সরকারকে ১৯১০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তে একটি চিঠি পাঠান। তাতে লেখা আছে, " I am directed to report for the information of the Government of India, that the attention of the Government has been drawn to four sedious books named in margin, which has been written by Ismail Hussain Siraji and printed and published by Bhut Nath Palit at the Navya Bharat Press.

1. Amal Prabaha
2. Udbodhan
3. Naba Uddipana
4. Uchhas

201-5 connwalis street, Calcutta. The author Ismail Siraji, is a native of Searaj Ganj in Eastern Bengal and Assam and a well known Muhammadan agitation of the province. His persecution under the criminal law is considered very unncessary by Sri Lanulot Hare". ৩২

চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্টেট D. Swinho রায় দিলেন "In this accused Mohammed Ismail Hussain Seraji charged under sections 124 A and 153A, Indian Penal Code. with reference to a Book entitled Anal Prabaha which means a stream of fire..... I find the accused guality under sections 124A and 153A Indian Penal Code, I convict him under those two sections and sentence him two years rigorous impronment.

D. Swinho

14th Sept, 1910. Chief Presidency Magistrate

সিরাজী স্বদেশী যুগে সর্ব প্রথম দন্ডিত মুসলমান কবি। তাঁর সম্পর্কে নবযুগ পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল, " সিরাজীর লেখায় ছিল দেশ প্রেম, ভারতীয় মুসলিমদের অতীত গৌর্য - বীর্যের কথা, আবেগ হৃদয়ের উষ্ণতা। কিন্তু তেমন সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। তাই তাঁর প্রতিভা সর্বত্র গামিনী হলেও (কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, নাটক সব কিছুই তিনি লিখেছেন) তাঁকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন দিতে পারে নি। তাঁর একটি বড় গুণ দূরদর্শিতা - অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিল তার জীবন। .... কলমকেই করেছিলেন তাঁর শ্বাস। সেই দিয়েই সংগ্রাম করে গেছেন জাতির কল্যাণে, সমাজের কল্যাণের জন্য – নিপীড়নের

বিরুদ্ধে , অত্যাচারের বিরুদ্ধে । তাঁর সমকালীন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি দেখেছিলেন আশার আলো । তাঁর কথা " সম্প্রতি নববর্ষে বিধাতার বিশেষ আশীর্বাদ এবং ইঙ্গিতে স্বদেশ প্রেমের যে তুমুল আন্দোলন প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে , এই প্রবাহ প্লাবনে দেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে একজনও ম্যাটসিনি , ওয়াশিংটন বা ওয়ালেসের মত আত্মোৎসর্গ করিতেন তাহা হইলে সত্য সত্যই এদেশ নব - জীবনের পথে অগ্রসর হইত । " ৩৪

কারণ সিরাজীর ' আকাঙ্খা ' (স্বরাজ , ৩রা চৈত্র , ১৩১০) ছিল

আমি চাহিনা সম্রাট (ভন্ডামীর কথা)
চাহি না সুন্দর বেশ ,
আমি চাহি শুধু এই অধিকার ,
ভারত আমার দেশ ।
আমি চাহি না দর্শন, চাহি না কাব্য
চাহি শুধু আমি এই ,
ভারতবর্ষ ভারতবাসীর
পর অধিকার নেই ।

অন্যান্য মুসলিম উপন্যাসিক বৃন্দ

মুসলিম মানসিকতায় বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত সাদরে গৃহীত হয়েছিল । হিন্দুদের উন্নতির সাথে মুসলমানদের পশ্চাৎপদ জীবনে পৃথক প্রদেশ হওয়ায় তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল । তাদের ধারণা ছিল এই শাসনতান্ত্রিক বিভাজনে তারা মুসলমান জাতি রূপে পৃথক সত্তা রাখতে পারবে ও এই পৃথক প্রদেশে সকল প্রকার সুবিধা ও সুযোগের মূলভাগী হবে তারা ।

স্বাভাবিক ভাবেই এই রাজনৈতিক বিভাজন তাদের মানসিকতাকে সাহিত্যের তীর্থপথেও এনে দিয়েছিল। হিন্দু কাছ হতে আলাদা হয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্য তারা সাহিত্য রচনায়ও পৃথক ভাবে ব্রতী হয়েছিল।

" ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হবার পূর্ব পর্যন্ত স্বতন্ত্র ভাবে ইসলামী সাহিত্য রচনা করার প্রয়াস সত্ত্বেও মুসলমানদের দিক থেকে হিন্দুদের সঙ্গে মিলে মিশে একটা সমন্বয় ধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস চলছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্যে বাংলার হিন্দুরা যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো, তাতে এ প্রয়াসের ভিত্তিমূলে এ শতকের গোড়াতে প্রথমবারের জন্য প্রচন্ড আঘাত লাগলো। মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ কেউ এ কথা বুঝতে পারলেন যে হিন্দু মুসলমানদের রাজনীতিতে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি এক নয়। মুসলমানকে বাঁচতে হলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পথ ধরেই এদেশে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এই শতকের প্রথম দশকে (১৯০৬) যেমন বাংলা দেশেই ঢাকা নগরীতে মুসলীম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়, সাহিত্যেও তেমনি এ সময় থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রচেষ্টা হয়।"৩৫

হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উপন্যাস রচিত হতে শুরু করে, যে উপন্যাসগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করা যায়।

হিন্দু বিদ্বেষী এই রূপ এক মুসলিম উপন্যাসিক হলেন মতীয়র রহমান খান (১৮৭২ - ১৯৩৭)। এই বিদ্বেষ প্রচারিত হলো তাঁর সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে। দুটো উপন্যাসে তিনি এই ভাবনাকে ব্যক্ত করলেন। প্রথমটা ' যমুনা '। প্রকাশকাল ১৯০৪। উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় বস্তু মুসলমান বীরের সাথে হিন্দু যুবতীর প্রেম। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ এই উপন্যাসের পটভূমি। উপন্যাসের নায়ক আহম্মদ শাহ আবদালী। ' যমুনা ' নামে একটি ব্রাহ্মণ কন্যা তাঁর প্রতি আসক্তা হলেন। এই প্রেম কাহিনীই উপন্যাসের বিষয়।

বাংলা সাহিত্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৫৭) এ শিবাজীর সাথে ঔরঙ্গজেবের কন্যা রোশেনারার ব্যর্থ প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেন। এটি ছিল অনুবাদ গ্রন্থ। মুসলিম মানসিকতায় প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনা দানা বাঁধতে থাকে।

মতীয়ুর রহমানের অন্য একটি উপন্যাস 'মোক্ষ প্রাপ্তি' (১৯১৪)। পূর্বের মতো জাতি বিদ্বেষ এই উপন্যাসে না থাকলেও এতে এক পন্ডিতের ধর্মান্তকরণের বিশদ চিত্র আঁকা হয়েছে। যদি পুরো ব্যাপারটাই ইতিহাসের সাথে সামঞ্জস্যহীন তেমনি সামঞ্জস্য নাই ধর্মান্তকরণের ব্যাপারেও।

মোজাম্মেল হক[3] (১৮৬০ - ১৯৩৪) এই মানসিকতারই উপন্যাসিক। তাঁর রচিত উপন্যাসের নাম 'দরাফ খাঁ গাজী' (১৯১১)। হিন্দু বিদ্বেষ নীতি এই উপন্যাসেও দেখা গেছে। নায়িকা লীলাবতী নামে এক ব্রাহ্মণ কন্যা। নায়ক মোস্তাফা বোখারী। এই মুসলিম যুবকের সাথে লীলাবতীর প্রণয় কাহিনীর আনুষঙ্গিক বর্ণনা এই উপন্যাসের বিষয়। এই উপন্যাসে হিন্দু সন্ন্যাসীদের হীনতা, মুসলমানদের পোষাকে তাদের মুগ্ধতা, মুসলমানদের দাড়ির প্রতি আকর্ষণ, হিন্দু দের মুসলমান ধর্ম গ্রহণের জন্য অপরাধীর মতো দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে থাকা এর মধ্যে প্রকাশিত। এখানেই সীমাবদ্ধ নয়, হিন্দুদের কাছে আজানের ধ্বনি মধুর এর তুলনায় 'দেবালয়ের মুখরিত করা শঙ্খ, কাঁসর ঘন্টার কর্কশ কোলাহল' বিরক্তিকর। মুসলমানদের অলৌকিক ক্রিয়া কান্ডে উপন্যাস পূর্ণ। লীলাবতীর মা এই বিয়েতে উৎসাহী এবং মেয়েকে রাজী করানোর দায়িত্ব লীলাবতীর মায়ের।

সৈয়দ আবু হোসেন বঙ্কিম বিরোধী উপন্যাসিক রূপেই পরিচিত। বঙ্কিমী স্টাইলকে অনুসরণ করে বঙ্কিমী বিকৃতি এই উপন্যাসগুলির মূল লক্ষ্য। তাঁর রচিত উপন্যাস গুলো 'দুর্গেশ নন্দিনী বা জিজাবজা', 'কপালকুন্ডলা বা সখের সতীন', 'যুগলাঙ্গুরীয় বা সতী সাধ্বী', 'ইন্দিরা বা ডাকিণী', ইঁদুর নাম বিষবৃক্ষ', কৃষ্ণকান্তের উইল বা বিধবা বিবাহ', 'আনন্দ মঠ বা নন্দের বন্দী', 'সীতারাম বা কাগজ রাজা'। লেখক এই সব উপন্যাসকে "দেশ হিতৈষণায় জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ'

বলে অভিহিত করেছেন । শুধু মাত্র বঙ্কিমের বিরুদ্ধাচারণেই এই গ্রন্থ শেষ হয়েছে । লেখক অনুকরণের বিকৃতি না ঘটিয়ে মৌলিক প্রতিভায় উপন্যাস রচনা করলে তিনি ভাল উপন্যাসিক হতে পারতেন ।

আরেক উপন্যাসিক মোহাম্মদ ইদরিস আলী (১৮৯৫ - ১৯৪০) তিনিও একই মানসিকতায় । তাঁর রচিত উপন্যাস দুটির নাম ' দনুজ দুহিতা ' ও ' বঙ্কিম দুহিতা ' । হিন্দু বিদ্বেষী প্রতি ক্রিয়া এখানেও ব্যক্ত ।

প্রতিক্রিয়া ধর্মী এই সব উপন্যাসে কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় । প্রতিটি উপন্যাসে হিন্দু নারীর সাথে মুসলমান যুবকের প্রেম । যেন অন্য ধর্মের নারীর সাথে প্রেম করা গৌরবের বস্তু । আর নারী যে ধর্মাবলম্বী সে ধর্মের এই প্রেমে যেন গ্লানির পরিচয় । এ ছাড়া হিন্দু নারীরা মুসলিম যুবকের প্রতি আসক্তা । এবং এর জন্য গৃহত্যাগেও রাজী । পিতা মাতাও যেন এই কার্যে সহায়তা করছেন । সিরাজীর ' ময় নন্দিনী ' তে প্রতাপাদিত্যের কন্যা অরুণাবতীর সাথে সেনাপতি মাহতাব খাঁর প্রেমে সাহায্যকারিণী প্রতাপাদিত্যের স্ত্রী । ' দরাফ খাগজী ' তে লীলাবতীর মা সাহায্যকারিণী ।

ধর্মান্তকরণ এই সব উপন্যাসের আরেক বৈশিষ্ট্য । প্রতিটি প্রেমে প্রেমিকা নিজের হিন্দু ধর্ম বিসর্জন দিয়ে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিতা হয়েছে । শুধু প্রেমিকা নয় বহু হিন্দুর এবং সন্ন্যাসীর ধর্মান্তরিত হওয়ার বিবরণ আছে । আর আছে হিন্দু ধর্মের , সংস্কারের , আচরণের তীব্র সমালোচনা । সমালোচনার তিনটি স্বরূপ (১) নায়ক নায়িকা সংলাপ বা কথোপকথনের ছলে হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করছে । (২) যে কোন উপন্যাসিক চরিত্র পুরুষই হোক বা নারীই হোক – হিন্দুদের অনুষ্ঠান বা ধর্মকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ , দেব দেবীকে নিয়ে অপমান ও মস্করা করা যেন স্বাভাবিক ঘটনা । (৩) কখনো কখনো সাম্প্রদায়িক বিতর্কের সূচনা উপস্থাপিত করা হয়েছে উপন্যাসে । এই বিতর্কে হিন্দুদের পরাজয় ও মুসলমানের জয় সুনিশ্চিত ।

উপন্যাসগুলিতে আছে মুসলিম অলৌকিকতাকে উপস্থাপনের চেষ্টা। ঝাড় ফুক দিয়ে রোগ প্রশমিত করার বহু ঘটনা এই সব উপন্যাসে সবলীলভাবে লিখিত। ইতিহাস বিকৃত, কোথাও অস্বীকৃত। কোথাও উদ্ভট। যেমন " প্রাচীন হিন্দুরা নাকি মুসলমান ছিলেন।" ৩৬

মুসলিম ঔপন্যাসিকের মধ্যে কায়কোবাদ রচনা করেছিলেন ' মহাশ্মশান ' (১৯০৪)। এই উপন্যাসে তিনি হিন্দুদের হীনমন্য করেন নি। তিনি মুসলমানদের হিন্দু জাতির সমকক্ষ করতে চেয়েছিলেন। বাংলার হিন্দু ঔপন্যাসিকরা হিন্দুবীরদের খুঁজে পেয়েছিল ভারতের মাটিতে -- রাজস্থানে, মহারাষ্ট্রে কিংবা বাঙলায়। মুসলমান সাহিত্যিকেরাও খুঁজল তাদের বীর। " তখন বাঙালী মাত্রই স্বজাতির অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবানুরাগী। হিন্দু অনুধ্যানে এল আর্য, রাজপুত ও মারাঠা গৌরব বৃত্ত। মুসলিমের চিত্ত পরিক্রমার ক্ষেত্র হল আরব, ইরাণ ও মধ্য এশিয়া। কায়কোবাদেও এই চেতনা প্রকট।" ৩৭

কায়কোবাদ তাঁর ' মহাশ্মশানে ' নায়ক করলেন আহম্মদ শাহ দুররাণীকে। মারাঠা পরাজিত হল পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে। কায়কোবাদ এই জয়ে অনুভব করলেন, " মুসলমানগণ যদিও এই যুদ্ধে জয় লাভ করেছিলেন বটে, তথাপি তাহারা এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে আহম্মদ শাহ দোরাণী কাবুলে চলিয়া যাওয়ার পর বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার শক্তি আর তাহাদের ছিল না।" ৩৮

কারণ কায়কোবাদ অদ্বিতীয় বীর সৃষ্টি করলেও ইংরেজদের প্রতি মানসিকতা তাঁর ভূমিকায় লিখে রেখেছিলেন " মুসলমানদের সৌভাগ্য বশতঃই ইংরেজগণ ভারতে আগমণ করিয়া তাহাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।" ৩৯

বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন একদিকে মুসলিম সমাজ নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। অন্যদিকে এই আন্দোলনের প্রভাবও তারা অস্বীকার করতে পারে নি।

ফলে এই অবস্থায় উপন্যাসে সামাজিক সমস্যা , শিক্ষা চেতনা ও উন্নত মানসিকতা বোধের লক্ষণ দেখা দিতে লাগল । দেখা দিতে লাগল ধর্ম নিরপেক্ষ চেতনাবোধ ও উদার সংবেদনশীল ভাবধারা ।

মহম্মদ নুরুল হক চৌধুরীর ' আকর্ষণ ' (১৯১৬) ও ' বঙ্গের জমিদার ' (১৯২৫) এই চেতনায় লেখা উপন্যাস । হক চৌধুরী এই উপন্যাসে কিছু কিছু চরিত্রের সৃষ্টি করলেন তাদের মাহাত্ম্য অক্ষুন্ন রইলো । শুধু তাই নয় তিনি এই হিন্দু চরিত্র - গুলির মধ্যে মানবিক অনুভূতি আরোপ করলেন । ' আকর্ষণে ' হিন্দু চরিত্র নরেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী এবং ' বঙ্গের জমিদার ' এর মৃণাল এই ধর্ম নিরপেক্ষ ও উদার সংবেদনশীল ভাবনার পরিচয় দেয় ।

মোহম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯ - ১৯৩৬) সৃষ্টি করলেন ' সরলা ' (১৯১৮) উপন্যাস । এই উপন্যাসে হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান চরিত্রের সংমিশ্রণ ঘটেছে । হিন্দু ও খ্রীষ্টান পেয়েছে যোগ্য মর্যাদা । সরলাও ফ্লোরা চরিত্রের সুন্দর বিকাশের মধ্য দিয়ে ঘটনার গতি সাবলীল হয়েছে । সরলা নায়িকা । কিন্তু বার বার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ধর্মান্তরিতা হতে হয়েছে । এতেই তার উপলব্ধি " সব ধর্মই মানুষ আছে । " এ অনুভূতি পরোক্ষে লেখকেরও । লুৎফর রহমানের আরেক উপন্যাস ' রায়হান ' (১৯১৮) । এই উপন্যাসে ব্যবসাকে মর্য্যাদার পেশা বলে উপস্থাপিত করা হয়েছে । সুদ ব্যবসাতে মুসলমানদের আকৃষ্ট করা হয়েছে ।

ধর্মনিরপেক্ষ ভাবের অন্যতম উপন্যাসিক ছিলেন মোহাম্মদ নাজিবর রহমান সাহিত্য রত্ন (১৮৭৮ - ১৯২০) । তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাস ' আনোয়ারা ' (১৯১৪) , গরীবের মেয়ে । তিনি উপন্যাসে দেখিয়েছেন সামাজিক দিক দিয়ে হিন্দু মুসলমানের সহযোগিতা কতখানি প্রয়োজন । এই উপন্যাসে তা ভাবগত দিক দিয়ে উপস্থাপন করা হয় নি । হয়েছে বাস্তবেও । তিনি বলতে চেয়েছেন হিন্দু মুসলমানের বিভেদের জন্য সাম্প্রদায়িকতার বদলে শ্রেনী চেতনার আরোপ বেশী । তাঁর উপন্যাসে ' শিক্ষক ' এক

পবিত্র ও মর্য্যাদার অধিকারী। " এই বোধের পিছনে হিন্দুদের শিক্ষা ও শিক্ষানুরাগ বহুলাংশে কাজ করেছে বলে মনে হয়। " ৪০

মোজাম্মেল হক (১৮৬০ - ১৯৩৩) ছিলেন আর একজন উদার পন্থী ঔপন্যাসিক। তাঁর রচিত ' জোহরা ' (১৯১৭) উপন্যাসে হিন্দু মুসলমান চরিত্রের সংমিশ্রন ঘটেছে। এই হিন্দু চরিত্রগুলি মুসলমানের চরিত্রের সাথে একই মাহাত্মে একই অনুভূতি ও একই সুরে গাঁথা। প্রত্যেকটি চরিত্রে আছে মানবিক গুণের আবেদন।

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম রচনা করেন ' পল্লীসংসার ' (১৯১৮) ধর্মীয় ভিত্তি বোধের উপর রচিত উপন্যাস। নায়ক ধর্মীয় নেতা মুর্শেদ এ রূপায়িত হয়েছেন। নায়কের পিতৃ বন্ধু রায় বাহাদুর তারিণী চরণ, রায় বাহাদুরের পুত্র সতীশ চরিত্র অঙ্কনে আবদুল হাকিম দরদী মন নিয়ে দেখেছেন। সম্ভ্রান্ত হিন্দু রূপেই তারা চিত্রিত।

পরবর্তীকালে মোহাম্মদ গোলাম জিলানির ' বরখিতের ডায়েরী ' (১৯২৬) ও ' ভুলের বাঁধন ' (১৯২৭) এ আছে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে স্থাপিত মৈত্রী সম্পর্কের পরিণতি ও এই মিলনের জয়গানেই উপন্যাস সমাপ্ত। ঠিক তেমনি কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২ - ১৯২৭) ' আবদুল্লা ' উপন্যাসে হিন্দুদের উদার চরিত্র, সরলতা বন্ধুপ্রীতি ও মানবিক কল্যাণ বোধের ধারণায় উজ্জ্বল।

উচ্চ উদার চেতনার পরশ পরবর্তীতে যে সব সাহিত্যিক পেয়েছিল তাঁদের উপন্যাসের চরিত্রগুলো ধর্মীয় আবেগের গন্ডী পেরিয়ে মানবীয় গুণের কসলে পরিণত হয়ে উঠেছে। আর এই ভাবে উদার রূপে গড়ে উঠার পিছনে বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের শেষে হিন্দু মুসলমান একতার চিন্তার প্রভাব পড়েছিল এই সব সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে।

মুসলিম সাময়িক পত্রিকা

উনিশ শতকে বাংলাদেশে মুসলমানদের ইংরাজী ভাষা শিক্ষার এক আন্দোলন হয়। মুসলমানদের উচ্চ বর্ণ আসরাফ গোষ্ঠীর হাতেই এর নেতৃত্ব ছিল। এঁদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় 'মহামেডান লিটারারী সোসাইটি'। আবদুল লতিফ ছিলেন এঁদের মুখপাত্র কিন্তু এই সোসাইটিতে বাংলা ভাষার চর্চা হয় নি। তিনটি ভাষায় আলোচনা হতো – উর্দু, ফারসী ও ইংরেজী।

কিন্তু লতিফ গোষ্ঠীর ভাবনায় মুসলিম সমাজ আবদ্ধ থাকেনি। বাংলা ভাষার প্রতি তাদের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। মুসলমান সমাজের বাংলা ভাষা সম্পর্কে তখন কি ধরণের ভাবনা ছিল তা প্রকাশিত হয় 'নবনূরে' (১৩১০)। " বঙ্গভাষা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষা আর কি হইতে পারে ? যাঁহারা জোর করিয়া উর্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষার আসন প্রদান করিয়া সমগ্র ভারতে মুসলমানের একই মাতৃভাষা করিতে চান, তাঁহারা কেবল অসাধ্য সাধনের জন্য প্রয়াস করেন মাত্র। "

আরও ভাবনার কথা প্রকাশিত হয়েছিল, " মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা বাঙালী হইয়া নিজেদের মাতৃভাষা উর্দু ও আরবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া, কিংবা বাংলা জানি না, ভুলিয়া গিয়াছি, এরূপ বলা – এই মারাত্মক রোগ কেবল এক শ্রেনীর মুসলমানের মধ্যেই দেখা যায়। তাঁহাদের এই রূপ নীতি অবলম্বন করা কি বাস্তবিক পক্ষে নিতান্ত লজ্জাজনক নহে ? যাহারা এরূপ আচরণ করে তাহারা যে আপন মাতা ও মাতৃভূমির নিন্দা প্রকাশ করে এবং নিজ মুখে নিজের মায়ের এবং দেশের দীনতা হীনতা জ্ঞাপন করে তাহাতে বিন্দু মাত্র সংশয় নাই। " ৪১

উনবিংশ শতকে বাংলার জাগরণের প্রভাব মুসলমানদের মধ্যেও ধীরে ধীরে বিস্তৃত হতে থাকে। এই প্রভাব শিক্ষা, বিজ্ঞান, ধর্ম, সাহিত্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

কালক্রমে বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখকরা সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। সাহিত্য ভাবনার শ্রেষ্ঠ মুকুর সাময়িক পত্র বা পত্রিকা। স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মালোচনা ও সাহিত্য রচনার তাগিদে মুসলমান সাহিত্যিকদের দ্বারা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ এ যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলে মুসলিম লেখকের পরিচালিত পত্রিকা গুলিতে দ্বিবিধ মনোভাবের প্রকাশ দেখা দেয়। এক দল বিরোধী অন্য দল হিন্দু মুসলমান ঐক্য বার্তা তুলে ধরার পক্ষপাতী।

ধর্মীয় ও স্বাতন্ত্র্য বোধ ও রক্ষণশীল ভাবনাকে যারা আশ্রয় করে পত্রিকা প্রকাশ করলেন তাদের পত্রিকা গুলো হলো 'বাসনা' (১৯০৮ - ৯) মাসিক পত্রিকা, প্রকাশিত হতো রঙ্গপুর থেকে, 'হিতকরী' (১৮৯০- ১৮৯২) পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো কুষ্ঠিয়া থেকে। 'নবনূর' (১৯০৩ - ১৯০৬) মাসিক পত্রিকা কলকাতা হতে প্রকাশিত হতো, 'সুধাকর' (১৮৮৯ - ১৮৯১) সাপ্তাহিক পত্রিকা, প্রকাশ কলকাতা।

ইসলাম ধর্মের ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে যারা ভাবনা প্রকাশ করতো – 'আহমদী' (১৮৮৬ - ১৮৮৯) পাক্ষিক প্রকাশ স্থান মৈমনসিংহ, 'হিন্দু মুসলমান সম্মিলনী' (১৮৮৭) মাসিক পত্রিকা, প্রকাশ স্থান মাগুরা, যশোহর, 'বালক' (১৯০১) সাপ্তাহিক, বরিশাল, 'ভারত সুহৃদ' (১৯০১) মাসিক, বরিশাল, 'প্রচারক' (১৮৯৯ - ১৯০২) মাসিক কলকাতা হতে প্রকাশিত, 'কোহিনূর' (১৮৯৮) মাসিক, প্রকাশ কুমার খালি পরে ফরিদপুর।

একদিকে নিজের রক্ষণশীলতা অন্যদিকে হিন্দু-কংগ্রেস বিরোধী – 'আখবারে এসলামিয়া' (১৮৮৪ - ১৯০৫) মাসিক পত্রিকা, মৈমনসিংহ, 'হাফেজ' (১৮৯৭) মাসিক, কলকাতা, 'হানিফি' (১৯০৩ - ১৯০৫) মাসিক, মৈমনসিংহ, 'ইসলাম' (১৯০০ - ১৯০১), মাসিক কলকাতা, 'ইসলাম প্রচারক' (১৮৯১ -

– ১৯১০) মাসিক , কলকাতা , ' মিহির ' (১৮৯২ - ৯৩) মাসিক কলকাতা , এই কাগজ পরে ' সুধাকর ' এর সাথে মিলিত হওয়ায় এর নাম হয় ' মিহির ও সুধাকর ' (১৮৯৫ - ১৯১০) সাপ্তাহিক কলকাতা ।

' ইসলাম প্রচারক ' ১৮৯১ এ যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তাদের ভাবনা ছিল বাংলা ভাষায় পত্র পত্রিকা প্রকাশ ও সাহিত্য চর্চা করার মধ্যে জাতীয় কল্যাণের পথ নিহিত । ইসলাম প্রচারকের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজের ধর্ম কথা প্রকাশ করা এবং ইসলাম ধর্ম প্রসার করার বাতাবরণ সৃষ্টি করা । " তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশিত সব লেখারই মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মের রজ্জুকে শক্ত করে ধরা এবং অন্যকে ধরতে উৎসাহিত করা । তাঁদের সমাজ বোধ বা জাতীয়তাবোধেরও মূল উৎস ছিল ধর্ম । তাঁরা ইতিহাস চর্চা করেছেন , ভেবেছেন ইতিহাস জাতীয় জীবন রক্ষার প্রধান অবলম্বন । তবে সে ইতিহাস ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের ইতিহাস । " ৪২

১৯০০ খৃষ্টাব্দের মে - জুন সংখ্যায় ' ইসলাম দর্শন ' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । এতে বলা হয়েছে " আমাদিগের ভারতীয় ভ্রাতাগণ – যাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই অথবা দুই একটি পাশ্ত হইয়াছেন এবং কিছু ইংরেজী ও দুই এক খানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন , তাঁহারাও উথলিয়া উঠিয়া আগ্রহ সহকারে বলিয়া থেলেন যে , নতুন দর্শনই দর্শন , পুরাতন দর্শন কিছুই না , অজ্ঞানতা অন্ধকার মাত্র ।"

১৯০১ এ ' প্রদীপ পত্রিকা 'র বিরুদ্ধে ইসলাম প্রচারকের নভেম্বর - ডিসেম্বর সংখ্যায় একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় । " তাহারা যেরূপ নানাবিধ প্রবন্ধে মাসিক পত্রিকাচয়ের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষ জাগাইতেছেন , তৎ পরিবর্তে তাহারা যদি এই উভয় জাতির একতা পথ অবলম্বন করিয়া লেখনী চালনা করিতে পারেন তবে সমাজের উপর বিষ বর্ষন স্থলে অমৃত বর্ষিত হয় । ..... বঙ্কিমবাবু যদি মোসলমানের কলঙ্ক অঙ্কনে মনোযোগী না হইয়া , তাহাদিগকে হিন্দুর সহিত প্রেমপাশে

বাঁধিতে চেষ্টিত হইতেন তবে কি আজ মোসলমান সমাজকে তাঁহার নামে মুখ ফিরাইতে দেখিতে পাইতাম । .... মোসলমানের হিংসা করিলে দেশের ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই । অতএব সকলের উচিৎ অন্তরের বিদ্বেষ চিরতরে মুছিয়া ফেলিয়া সরল হৃদয়ে মোসলমানকে স্নেহ করা । "

' ইসলাম প্রচারক ' কতখানি ধর্মীয় বিষয়ে উগ্র ছিল , তার একটি চিত্র । ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ' মিহির ও সুধাকর ' পত্রিকা যা মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত হতো সেই পত্রিকায় নাটকের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা প্রকাশিত হয় । তার বিরুদ্ধে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ - এপ্রিল মাসে মন্তব্য করা হলো , " আজ আমরা নিতান্ত আক্ষেপের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মুখপত্র ' মিহির ও সুধাকর ' আপনার চিরন্তন পবিত্র প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া থিয়েটারের কলুষিত বিজ্ঞাপন বক্ষে ধারণ পূর্বক , আমাদের স্তম্ভিত করিয়াছে । কেবল তাহাই নহে থিয়েটারের লম্বা চওড়া সমালোচনা বাহির করিয়া , মুসলমান গ্রাহক পাঠকদিগকে ভীষণ নরকের দিকে আহ্বান করিতেছে । .... এইরূপ থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা প্রকাশ দ্বারা যদি একটি মাত্র মুসলমানের দেহ কলঙ্কিত হয় , আধ্যাত্মিক অবণতি ঘটে , তবে কি স্বত্বাধিকারী এবং সম্পাদক সাহেব তজ্জন্য দায়ী হইবেন না । পাপের প্রশ্রয় দান করা কি রূপ মহাপাপ , আমরা মৌলবী সাহেবদিগের নিকট তাহার ফতোয়া তলব করি । "

১৯০৫ এ ঘটল বঙ্গভঙ্গ । ' ইসলাম প্রচারক ' রাজনৈতিক ভূমিকায় সক্রিয় হয়ে উঠল । এই সময় কুমিল্লায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ হয় । এই প্রসঙ্গে ১৩১৩ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপারে মন্তব্য করা হয় , " কুমিল্লায় এবার যে ভীষণ কান্ড ঘটিয়াছে , তাহা বোধহয় কাহারও অবিদিত নাই । হিন্দুর বিকৃত স্বদেশী আন্দোলনের কুফল এমন ফলিতেছে । বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধবাদী বিকৃত স্বদেশী আন্দোলনকারী হিন্দু নেতৃবৃন্দের বিদ্রোহ মূলক বক্তৃতায় দেশে অশান্তির আগুন জ্বলিয়াছে । ঢাকার সর্বজন মান্য নবাব খাজা সলিমুল্লা বাহাদুর , অনারেবল মৌলবী

সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী খান বাহাদুর , মৌলবী সৈয়দ হোসেন হায়দার চৌধুরী সাহেব প্রভৃতি মুসলমান নবাব ও জমিদারদিগকে মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে দেখিয়া ইহাদের গাত্র জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে — হৃদপিন্ড বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে । ইহারা ধোকা দিয়া মুসলমানদিগকে বোকা বানাইয়া স্বদেশে আনয়নের চেষ্টা করিয়াছিল , কিন্তু হঠাৎ মুসলমান দলপতিগণ সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করাতে তাহাদের বড় সাধে বাদ পড়িল , সকল আশা ভরসা মিটিয়া যাইবার উপক্রম হইল । পাল - বানার্জি ও তাঁহাদের চেলা গণ বঙ্গের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া সভা সমিতি করিতেছেন , তাহাতে কোন মুসলমান কখনও বাধা প্রদান করেন নাই । কিন্তু যেই মাত্র নবাব বাহাদুর কুমিল্লায় গিয়া সভা করিবেন বলিয়া প্রচারিত হইল , অমনি ' বন্দেমাতরম ' এর চেলাগণ নতুন ফিরিক ঘটাইল । ..... হিন্দুর এত বাড়াবাড়ি মুসলমানগণ অকাতরে সহ্য করিতেছেন , ইহা মুসলমান নেতাদিগের শান্তিপ্রিয়তা ও উদারতার ফল । নচেৎ নেতাগণ একটু মাত্র হুঁ করিলে হিন্দুদিগের আর নিস্তার ছিল না । .... হিন্দু মুসলমানের এ ভীষণ সংঘর্ষের ফল বড়ই শোচণীয় হইবে — ভারতের উন্নতির শত বৎসর পিছাইয়া পড়িবে । " ৪৩

১৩১৪ এর মাঘ সংখ্যায় ' ইসলাম প্রচারক ' মন্তব্য করছে , " হিন্দু গণ এক দিকে মুসলমানদিগকে ' ভাই ভাই ' বলিয়া সাদরে আহ্বান করিতেছেন , অন্যদিকে হিন্দু জমীদার ও অন্যান্য শ্রেনীর হিন্দুদিগের ভীষণ অত্যাচারে দারিদ্র মুসলমানগণ জর্জরিত । প্রত্যহই নূতন নূতন অত্যাচার কাহিনী আমাদের শ্রবণ গোচর হইয়া , আমাদিগকে মর্মাহত করিয়া তুলিয়াছে । কোরবানী কার্যে এখনও বহু সংখ্যক অত্যাচারী দুর্দান্ত হিন্দু জমিদার মুসলমানদিগকে প্রবল রূপে বাধা দিতেছেন । স্বজাতি আন্দোলনে মুসলমানগণ পদে পদে হিন্দুদিগের হস্তে বাধা প্রাপ্ত হইতেছেন । এই জাতিই কোন প্রাণে ও কোন মুখে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপনের কথা বলেন , আমরা বুঝিতে অক্ষম ।

মুসলমানগণ এক্ষণে তাঁহাদের কপট বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃভাব বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন । এই কপটতার জন্যই মহা বিচারক খোদাতাআলা তাঁহাদের ২২ বৎসরের কংগ্রেসকে

এ বৎসর সুরাট নগরে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। তাপ্তী নদীর পানিতে কংগ্রেসের চিতা ভস্ম বিধৌত হইয়াছে।"

কংগ্রেসের প্রতি আরও মন্তব্য "২২ বৎসরের কংগ্রেস ২৩শে পা দিয়া যমের বাড়ী গিয়াছে। সুখের বিষয় ২।৪ টী নগন্য মুসলমান নামধারী বিকৃত স্বদেশী পান্ডা ব্যতীত কোন নামজাদা মুসলমান কংগ্রেসের সেই মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না।" ৪৪

'নবনূর' এর প্রকাশ ১৩১০। নবনূরের উদ্দেশ্য ছিল মাতৃরূপিণী মাতৃভাষা সেবাকে পুনাব্রত জ্ঞানে এই ব্রতে অংশ গ্রহণ করা। "বঙ্গভাষাকে একটী নূতন মূর্ত্তি প্রদান করিয়া 'মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্যের' শক্তি সঞ্চয় করা প্রত্যেক বঙ্গীয় মুসলমানেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইহাতে বঙ্গভাষারও অঙ্গ বৃদ্ধি হইবে এবং আরবী পারসী প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্য হইতে কত অমূল্য রত্ন ভাষা-স্তরিত হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের বক্ষে মনিমালার ন্যায় দীপ্তি বিকাশ করিবে।" ৪৫

'নবনূরে' একদিকে হিন্দু লেখকের প্রতি যেমন আক্রমণ ছিল তেমনি হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতিও তাদের কাম্য ছিল। ১৩১০ এর পৌষ সংখ্যায় নবনূর 'মাতৃ-ভাষা' ও বঙ্গীয় মুসলমান প্রবন্ধে লিখছে, "যে শিক্ষিত হিন্দু সমাজ কংগ্রেস করেন কনফারেন্স এবং বক্তৃতা মঞ্চে মুসলমানকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্বীয় দল-ভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই আবার গৃহে আসিয়া শান্ত সমাহিত চিত্তে মুসলমানের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন। গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়া যাঁহাদের স্বভাব, তাহাদের প্রতি মুসলমান সমাজ কোন সাহসে বিশ্বাস স্থাপন করিবে? ..... কেবল বাক্য নহে কার্য্য দ্বারা প্রমাণ করুন আপনারা মুসলমানের শুভাকাঙ্খী আপনারা মুসলমানের প্রতি ন্যায্য বিচার করিতে অকুণ্ঠিত চিত্ত ..... যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে কংগ্রেস ও কনফারেন্স সবই বৃথা, সবই বালকের ঔড়া মাত্র – তাহা দেশের দুই বিভিন্ন জাতির পুরাতন সদ্ভাব সংহার করিয়া শত্রুতা বৃদ্ধি করিবার যন্ত্র বিশেষ।" ৪৬

' নবনূরে ' ১৩১১ সালে ওসমান আলী রচিত ' দুমুখো ' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । দুমুখো সাপের সাথে তিনি হিন্দুদের তুলনা করেছেন । তিনি উদাহরণ সহযোগে বলছেন , " দেশে কংগ্রেস হইতেছে , ভারতে এক বিরাট জাতি সংগঠনের জল্পনা কল্পনা , উদ্যম উদ্যোগ হইতেছে , মুসলমানগণ কিন্তু উহাতে যোগ দিতেছেন না । দুমুখো অমনি সুধাবর্ষণ করতঃ বলিতে লাগিল – ভারতে হিন্দু মুসলমান ভাতৃগণ আমাদের সহিত কংগ্রেসে যোগ দাও , দেখিবে সত্বর রাজনীতি সোপান টকাটক অতিক্রম করিয়া ফেলিব , আপন আপন স্বত্বাধিকার বুঝিয়া লইব , দেশের দারিদ্রতা ও দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে , সকলেই পরম সুখে জীবন যাপন করি । .... বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ব্যাপারেও বলিতে লাগিল , " বাঙ্গালী জাতি বিভক্ত হইতে চলিয়াছে , বাঙালীর ধর্ম কর্ম্ম আচার ব্যবহার , ভাষা সাহিত্য সমস্তই বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে , অতএব ভাই বঙ্গবাসী মুসলমানগণ তোমরা চুপ করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিও না , আইস আমাদের সহিত মিলিত হও , গভর্ণমেন্টের কার্য্যের প্রতিবাদ কর নতুবা সমূহ অনিষ্ট পাতের সম্ভাবনা । পাঠক এই সব সুধা মাখা কথাগুলির ভিতর কতটুকু স্বার্থপরতা , কতটুকু খলতা বা কপটতা বিদ্যমান আছে তাহা বুঝিতে পারেন কি ?" ৪৭

' নবনূর ' কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছে । আবার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী রচনাও পত্রিকায় প্রকাশিত করেছে । ১৩১২ এর আশ্বিন সংখ্যায় একিন উদ্দীন আহম্মদের ' বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । প্রবন্ধে লেখক বলছেন , " লর্ড কার্জ্জন বাহাদুর বিনা কারণে হঠাৎ এই সৃষ্টি ছাড়া প্রস্তাবের প্রবর্ত্তন করিয়া দেশের শান্তি অপহরণ করিয়াছেন । ..... আমাদের মুসলমান দলপতিগণের সাধারণ মত কি , তাহা এখনও আমরা জানিতে পারি নাই । দেশের মুসলমানগণ অধিকাংশ স্থানেই নূতন প্রদেশ সৃষ্টির প্রতিবাদ করিয়াছেন । সে জন্য মুসলমান সাধারণের মত যে নূতন প্রদেশ সৃষ্টির বিপক্ষে তাহা নিশ্চিত । " ৪৮

১৩১১ সালে ' নবনূরে ' জীবেন্দ্র কুমার দত্ত ' ' হিন্দু মুসলমান মিলন কি

সম্ভব ?' নামে এক প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি বহু যুক্তি উপস্থাপিত করে অন্তিমে এক মিলনের কবিতা লেখেন —

জয় ভারতের জয়,
হিন্দু মুসলমান ভারতের সন্তান
কখনি ভিন্ন নয়
একই মার শোণিত ধার
দৌহারি বঙ্গে বয়।

'আল এসলাম' পত্রিকাও হিন্দু সমাজ কর্তৃক মুসলমানদের অবহেলায় অসন্তুষ্ট ছিল। আকবর উদ্দীনের 'বর্তমান বাঙ্গা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান' প্রকাশিত হয় ১৩২৩ মাঘ সংখ্যায়। লেখক বলছেন, "বাঙালীর Nationality প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, বাঙালীর গৌরব বর্দ্ধিত করিতে হইলে, কেবল হিন্দুদের ভিতর জাতীয় প্রেরণা দিলেই চলিবে না। মুসলমানের প্রাণের তারের তারে ঝঙ্কার দিতে হইবে তাহাদের মনপ্রাণ মাতাইয়া তুলিতে হইবে। তাহা না করিয়া তোমরা, হিন্দু লেখক-গণ, কেবল নিজের টুকুই বোঝ, নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত থাক এবং সেই সঙ্গে আমাদিগকে উপর হইতে বলপূর্বক টানিয়া নীচে নামাইয়া দাও কেন ?"

এই কেন র উত্তর খুঁজতে গিয়েই বোধহয় বহু মুসলিম পত্রিকা স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। ১৩১৩ এর ফাল্গুন সংখ্যায় 'ইসলাম প্রচারক' এক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। প্রবন্ধটিতে বিপথগামী হিন্দুদের স্বদেশী আন্দোলন বর্জ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করা হয়। পত্রিকা মন্তব্য করা হয়, "স্বদেশী তাঁতের শব্দ স্তব্ধ হইয়াছে। বিলাতী দ্রব্যে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র কাগজের প্রপাগাণ্ডায় ও নেতাদের শুষ্ক বক্তৃতায় স্বদেশী আন্দোলন টিকিয়া আছে। অলীক হিন্দু স্বদেশী আন্দোলন তাঁহাদের দেবতারই মতো দেখিতে। বাহিরে চাকচিক্য রহিয়াছে, কিন্তু নির্জীব।"

১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ইসলাম প্রচারক লিখল , "যে বাঙালী হিন্দুরা স্বদেশী আন্দোলনের নামে দরিদ্র ও সরল মুসলমানদের নিপীড়ন করেন । তাঁরা বিলাতী বস্ত্র , চিনি ও লবণ নষ্ট করে ফেলায় মুসলমানদের অনেক বেশী দামে এই সব জিনিষ কিনতে হয় । বাধ্য হয়েই এই কষ্ট তাঁদের স্বীকার করতে হয় । কিন্তু আর কত কাল মুসলমানেরা এই দুর্ভোগ ভুগবেন ? জোর করে ' হিন্দু লাইন ' অনুসরণ করতে বাধ্য করার ফলেই কুমিল্লা , ত্রিপুরার মগরা ও হাতিয়ারা , ময়মনসিংহের জামালপুর , দেওয়ান গঞ্জ ও বখসিগঞ্জ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে । "

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১৪ সাল , মাঘ) ' ইসলাম প্রচারক ' লেখে , " ন্যায় পথ ভ্রষ্ট হিন্দু স্বদেশী আন্দোলন ইসলামের বিরোধী । ইসলাম ধর্ম কি এই নির্দেশ দেয় যে বিদেশী দ্রব্য আমদানীতে বা বৈদেশিক বানিজ্যে বাধা দাও ? না কখনই নয় । এই ধরণের অস্বাভাবিক নির্দ্দেশ ইসলাম ধর্মের পক্ষে দেওয়া কখনই সম্ভব নয় । বরঞ্চ এই ধরণের আচরণ ইসলাম ধর্মের নিকট পাপ বলেই গণ্য ।" ৪৯

মুসলিম পত্রিকা ' সোলতান ' ও ' দি মুসলমান ' (ইংরাজী) বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিল । ' ইসলাম প্রচারক ' এই দুটো পত্রিকাকে কংগ্রেসের মুখপত্র বলে প্রচার চালাত । কারণ ' সোলতান ' তার মুসলমান পাঠকের কাছে বক্তব্য তুলে - ধরেছিল যে হিন্দুদের আর্থিক জীবনে ও শিক্ষায় আত্ম নির্ভরতার উদাহরণ তারাও যেন গ্রহণ করে । " স্বাবলম্বন ও স্বনির্ভরতা ছাড়া মানুষ বড় হতে পারে না । .... আমরা যেন কোন মতেই দেশীয় শিল্প সংস্কৃতিকে না ত্যাগ করি । হিন্দু কিংবা ইংরেজ কেউ আমাদের অগ্রগতিকে বাধা দিতে পারবে না । .... নিজের পায়ে দাঁড়াও ও প্রতিষ্ঠিত হও উচ্চ শিক্ষার জন্য । " ৫০

" 'The Soltan' stood for a rather different and more qualifie kind of support for nationalism. Emphasising quite as much as any communalist the special position and claims of the Muslims, often sharply critical of certain aspects of Hindu behaviour, it at the same time totally rejected the pro-British Political line being put forward from Aligarh and Dacca..... It was a warm supporter of Swadeshi and boycott, though in part it seems because it felt that otherwise the Hindus would steal a march over the Muslims". ৫১

সোলতান ১৯১০ অবধি চলে এবং পরে বন্ধ হয়ে যায় । ১৯২৩ এর এপ্রিল আবার প্রকাশিত হয় ' সোলতান ' । তখন দেখা যায় এই পত্রিকার দৃষ্টি ভঙ্গীতে পার্থক্য দেখা দিয়েছে । ১৯২৩ এর এপ্রিলে ' সোলতান ' মন্তব্য করে " স্বদেশী ও বর্জনের বিরোধী আন্দোলনের সময়ে রাজনৈতিক হত্যার সূত্রপাত হয় এবং একদল ভদ্র দস্যুর আবির্ভাব ঘটে । সৌভাগ্য বশতঃ তখন মুসলমানেরা এই দস্যুতা , নর হত্যা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না । " ৫২

স্বদেশী আন্দোলনের পরেই বাংলায় এল বিপ্লববাদ । বাংলার দামাল কিশোরের দল সর্বভারতীয় স্তরে পরিকল্পনা রচনা করল দেশকে মুক্ত করতে । পথ ছিল সশস্ত্র । এই বিপ্লবাত্মক আন্দোলন হতেও মুসলিম সমাজ ও পত্র পত্রিকা নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল । তার কারণও ছিল । (১) এরা সরকার বিরোধী যে কোন আন্দোলন এর বিরোধী ছিল । (২) তারা মনে করত সরকার বিরোধী কার্যকলাপ মুসলিম বিরোধী কার্যকলাপ।(৩) তারা মনে করত বিপ্লবী আন্দোলন বা এই উগ্রপন্থা উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদেরই নামান্তর । তাদের ধারণা ছিল তিলক , অরবিন্দ , বিপিনচন্দ্র বা ব্রহ্ম বান্ধবের জাতীয়তাযে সূত্র তা মুসলমান বিরোধী । যার জন্য ' ইসলাম প্রচারক ' (জ্যৈষ্ঠ , ১৩১৪) মুসলমান যুবকদের হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদের সাথে যোগ দিতে নিষেধ করে ।

" স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই মুসলমানেরা শিল্পে বানিজ্যে ও কৃষিতে অংশ গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে উদ্যোগী হন। এমনকি ' ইসলাম প্রচারক ' আধুনিক শিল্প বিজ্ঞান ও কৃষি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের জন্য মুসলমান ছাত্রদের ইউরোপ আমেরিকা ও জাপানদেশে প্রেরণের কথাও আলোচনা আলোচনা করে। এই ভাবে স্বদেশী আন্দোলনের অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম মুসলমানদের আর্থিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পথে চলতে উৎসাহিত করে। " ৫৩

' মুসলমান ' পত্রিকা চালাতেন মৌলভী মুজিবর রহমান। তাঁর জাতীয়বাদী দৃষ্টি ভঙ্গী ছিল। ' মুসলমান ' ছিল ইংরেজী পত্রিকা। কিন্তু মুসলিম মানসিকতার ভিন্ন রূপের উদাহরণের জন্য এই পত্রিকা হতে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করলাম।
"The 'Mussalman' was founded with a view to organise Muslim public opinion against the partition of Bengal." .....
The interest of our complex and composite Indian Nationality- a nationality still in the making and therefore requiring delicate nurture and handling on our part, this has been and will continue to be the first interest of the Mussalmans. But we shall be equally zealous, vigilant and in asserting, upholding and safe guarding the rights, privileges and interest of the Mussalman as a community. Nor do we think that there is anything incongruous or mentally contradictory in this our two fold claim." ৫৪

' মুসলমানে ' প্রকাশিত হলো বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ , "The ..... inhabitants of district of Faridpur in the new province of Eastern Bengal and Assam respectfully sheweth - that your memorialists feel aggrieved at the partition of Bengal as carried out by the Government Of India by a proclamation of the Ist September, 1905, and earnestly pray that it be

modified or withdrawn" (8/2/1907). ৫৫

কংগ্রেস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 'মুসলমান' মন্তব্য করছে, 'The twenty-second Indian National Congress has come and gone. It was the largest National Assembly that has ever been in this country. It is most gratifying to see that the people in general and our co-religionists in particular are taking greater interest in this great Institution year after year. This year the Mahomedans who joined it either as delegates or as visitors were not insignificant and we are glad to note this political awakening on the part of the Indian Mussalmans" (18.1.1907) ৫৬

স্বদেশী যুগে বহু উদ্যোক্তাদের বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েছিল 'মুসলমান'। তাই তাদের ক্ষোভের কথা প্রকাশ করে মন্তব্য করছে, That example is more potent than precept is well known to all and it is a matter of considerable regret that many people who advocate or preach Swadeshi are not themselves so scrupulous about Swadeshism as they ought to be. They appear to think that their duties lies in advocating or supporting the case only and it does not matter as to what they practise privatly. This smacks of duplicity and insincerety, nay more, if it be judged from strictly moral point of view, it will be found to be more or less dishonesty."(10.5.1907). ৫৭

এই যুগের আরেক পত্রিকা ছিল 'নূর - অল - ইমান'। পত্রিকায় সাহিত্য চর্চা হতো। ১৩০৮ সালের আষাঢ় সংখ্যায় নাছিরুদ্দিন আহম্মদ নামে রাজশাহীর এক কবি 'আবেদন' নামে এক কবিতা লেখেন। ইসলামের মানসিকতা এই কবিতায় একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কবি হিন্দু মুসলমানকে দেশমাতার দুটি চরণ রূপে কল্পনা করেছেন —

" এ ভারত হিন্দুস্থান যেন একজন।
হিন্দু মুসলমান তার দুই পদ হন ॥
এই দুই জাতির উপর ভর দিয়া ।
দেশ মাতা উন্নতিতে যাবেন ধাইয়া ॥
এর মাঝে এক পদ খোঁড়া যদি হয় ।
আছাড় খাইয়া মাতা পড়িবে নিশ্চয় ॥
উন্নতির পথে চলা বিফল হইবে ।
আছাড়ের চোটে মাতা জ্ঞান হারা হবে ॥
শিয়ালে কুকুরে তার মাংস খুবি খাবে ।
দেশবন্ধু হিন্দুরা কি খেয়ালে করিবে ॥

• • • • •

অষ্টম অধ্যায়

স্বদেশী আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য

১। ইসলামী বাঙলা সাহিত্য – সুকুমার সেন, পৃ : ভূমিকা

২। Mustafa Nurul Islam, Bengali Muslim Public opinion As reflected in Bengali Press 1901 – 1930, Bangla Academy, Dacca, Chapter I.

৩। বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, অমলেন্দু দে, পৃ : ১৭৭ - ৭৮

৪। The Swadeshi Movement in Bengal P -19-20.

৫। পূর্বোক্ত, পৃ : ১৮

৬। পূর্বোক্ত, পৃ : ১৮

৭। পূর্বোক্ত, পৃ : ১৯

৮। কৃষ্ণ কুমার মিত্র – 'আত্ম চরিত', পৃ : ২৩৬

৯। বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি – বদরুদ্দিন উমর, পৃ : ১৪

১০। গদ্য শিল্পী মীর মশারফ – সৌমিত্র শেখর, পৃ : ১৪ - ১৫

১১। রত্নবতী – মীর মশারফ, রিপ্রিন্ট, পৃ : ১১৩

১২। পূর্বোক্ত, পৃ : ১২৪

১৩। আহম্মদ শরীফ, ইংরাজ আমলে মুসলিম মানসের পরিচয়ে সূত্র, সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা' (ঢাকা ১৩৭৬) পৃ : ৪৩

১৪। বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি – নাজমা জেসমিন চৌধুরী, পৃ : ২০৭

১৫ । মীর মশারফ রচনা সম্ভার , ২য় খন্ড , পৃ : ২৩৬

১৬ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৮২

১৭ । পূর্বোক্ত , ১ম খন্ড , পৃ : ৩১৯ - ২০

১৮ । গদ্যশিল্পী মীর মশারফ , পৃ : ২৩

১৯ । আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা , পৃ : ২৪২ - ৪৩

২০ । মীর মশারফ রচনা সম্ভার , ৩য় খন্ড , পৃ : ৭৩

২১ । মুনীর চৌধুরী ' মীর মানস ' পৃ : ১৮৪

২২ । বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি , পৃ : ২৩৯

২৩ । স্বদেশী যুগে কারা দন্ডিত কবি সিরাজী , শিশির কর , পৃ : ২

২৪ । আল এসলাম , বৈশাখ , ১৩১৭ , পৃ : ৩৩

২৫ । বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা , পৃ : ৩৬৩

২৬ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১৮৬

২৭ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১১৭ - ৮

২৮ । বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি , পৃ : ২৬৩

২৯ । আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা , পৃ : ২৮৬

৩০ । বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি , পৃ : ২৬৭

৩১ । মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া , পৃ : ৪৭

৩২ । Proceedings of the Home Department, October, 1910
সূত্র স্বদেশী যুগে কারাদন্ডিত কবি সিরাজী , পৃ : ১১-১৬

৩৩ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১৪ - ১৬

৩৪ । নব্য ভারত , ফাল্গুন , ১৩১২ , ' জলন্ত প্রাণ ' প্রবন্ধ

৩৫ । বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত আধুনিক যুগ , ১৯৫৬ , ঢাকা

৩৬ । মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া , পৃ : ৪৪

৩৭ । আহম্মদ শরীফ ' কালিক ভাবনা ' ঢাকা (১৯৭৪) , পৃ : ১২৪

৩৮ । মহা শ্মশান কাব্য (২য় সংস্করণ) ঢাকা , ১৯৪০ , পৃ : ৮০০

৩৯ । পূর্বোক্ত , (৩য় সংস্করণ) ভূমিকা , পৃ : ৬২০ - ৬২১

৪০ । মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া , পৃ : ৬৬

৪১ । খাদে আল এসলাম বর্ষতাযী , বাঙালীর মাতৃভাষা , আল এসলাম , কার্তিক ১৩২২

৪২ । আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা , পৃ : ১৭৮

৪৩ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২০১ - ১০

৪৪ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২২১

৪৫ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৭১ - ৭২

৪৬ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৭৭

৪৭ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৭৭ - ৭৮

৪৮ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৮১

৪৯ । বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ , পৃ : ১৮৯

৫০ । সোলতান , ১০ই সেপ্টেম্বর , ১৯০৭

৫১ । The Swadeshi Movement in Bengal P 438-39.

৫২ । Mustafa Nazrul Islam Bengal Muslim Public Opinion P - 309 - 310.

৫৩ । বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ , পৃ : ১৯২

৫৪ । Selections from 'The Mussalman' ed. by Bhuiyan Iqbal - Forward Page.

৫৫ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১০১

০৬ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৫

০৭ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৩৩ - ৩৪